সদস্য স্তর

বাংলাদেশ স্কাউটস

সদস্য স্তর

(রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম)

MEMBERSHIP BADGE

(Rover Scout Programme)

বাংলাদেশ স্কাউটস

BANGLADESH SCOUTS

সদস্য স্তর
(রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম)

স্বত্ব : বাংলাদেশ স্কাউটস

সংকলনে : রোভার সহচর ও সদস্য স্তর টাস্কফোর্স

সম্পাদনা : বাংলাদেশ স্কাউটস, প্রোগ্রাম বিভাগ

সার্বিক সহযোগিতায় : জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
জাতীয় কমিশনার প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ স্কাউটস
জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস
নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস।
জনাব মোঃ আবু মোতালেব খান
যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস।
জনাব মো: রুহুল আমিন
উপ প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস।
জনাব মুহাম্মদ আবু সালেক
পরিচালক (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস।
জনাব শর্মিলা দাস
সহকারী পরিচালক (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস।

প্রকাশনায় : ব্যবস্থাপনা কমিটি, জাতীয় স্কাউট শপ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও ডিজাইন: স্কাউটার মোঃ মাঈনুল হক
দিগন্ত স্কাউট গ্রুপ।

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭
দ্বিতীয় প্রকাশ : জুন ২০০৮
তৃতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩
চতুর্থ প্রকাশ : মে ২০১৭

মূল্য : ২৮ (আটাশ) টাকা।

বাংলাদেশ স্কাউটস : ISBN 984-32-1629-11

মুদ্রণে : সৃষ্টি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
৩/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। মোবাইল:০১৭৫-৪৯২৮৭

মুখবন্ধ

স্কাউট আন্দোলন একটি আর্ন্তজাতিক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম। শিশু-কিশোর ও যুবকদের অবসর সময়ের সঠিক ব্যবহার করে তাদের সুশৃংঙ্খল, পরোপকারী, আত্মনির্ভরশীল দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে তৈরিতে স্কাউটিং কার্যক্রম যুগযুগ ধরে খুবই সহায়ক বলে বিবেচিত হচ্ছে। সদস্য স্তর বইয়ে যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো যথাযথভাবে অনুশীলন করে রোভার স্কাউটরা নিজেদেরকে রোভার স্কাউটদের সর্বোচ্চ সম্মান প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনের লক্ষ্যে প্রথম ধাপ অতিক্রমের উপযোগী রূপে তৈরি করে। কাজেই রোভার স্কাউটদের জন্য এই বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রোভার স্কাউট পর্যায়ের প্রথম বই সদস্য স্তর। স্বাভাবিক ভাবেই স্কাউটিং শিক্ষার জন্য এই বইয়ের অনুশীলন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

তবে স্কাউট কার্যক্রম কোন সময়ই বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকে না। স্কাউটিং মূলতঃ মুক্ত অঙ্গনের শিক্ষা। প্রকৃতির উদার পরিবেশে আনন্দময় খেলাধুলা ও শিক্ষার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয় তা জীবন গঠনে সুন্দরভাবে কাজে লাগে। বর্তমান বইটির বিষয়বস্তু অনুশীলনের পথ ধরে ছেলে-মেয়েরা রোভারিংয়ের আনন্দময় জগতে প্রবেশ করবে। সেই সঙ্গে তারা সকলের উপকারে নিজেদের দক্ষ করে গড়ে তুলবে। এভাবে একজন রোভার সেবার মূলমন্ত্র অনসুরণে জীবন গঠনে তৎপর হয়ে জাতির যোগ্য নাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে।

রোভার স্কাউট ইউনিটে এ বইয়ের বিষয়গুলো অনুশীলন ও ব্যক্তি জীবনে বাস্তবায়নের জন্য রোভার স্কাউট এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিট লিডার ও অভিভাবকবৃন্দকে অনুরোধ জানাচ্ছি। স্কাউটিং কার্যক্রমে ও ক্যাম্পিং-এ স্কাউটদের নিরাপত্তার বিষয়ে ইউনিট লিডার ও অভিভাবকবৃন্দকে অধিক যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। তাঁরা এ বিষয়ে যৌথভাবে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি। এছাড়া চলমান প্রক্রিয়ায় আগামীতে রোভার প্রোগ্রামকে আরো বেশী যুগোপযুগী করার ক্ষেত্রে ইউনিট লিডারসহ সকল স্তরের বয়স্ক নেতাদের নতুন নতুন চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি। সদস্য স্তর বইটির পান্ডুলিপি প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস প্রোগ্রাম বিভাগ ২০১১ সালে পৃথক টাস্কফোর্স গঠন করে। যে টাস্কফোর্সের আহবায়ক, সদস্য ও সদস্য সচিব সকলেই রোভার স্কাউট হওয়ায় তাদের (রোভার স্কাউটদের) মননশীল চিন্তা ভাবনা ও চাহিদা অনুযায়ী বইয়ের পান্ডুলিপি প্রণীত হয়েছে। তাদের এই কাজটি নির্ভুল এবং সার্বজনীন করার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন অভিজ্ঞ রোভার স্কাউট লিডার সার্বক্ষনিক পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই মুহূর্তে আমি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। পন্ডুলিপি প্রণয়নে তৎকালীন সময়ের জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) ও জাতীয় উপ-কমিশনারগণ (প্রোগ্রাম) যে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন সে জন্য তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

আশাকরি রোভার সহচর বইটি দেশে রোভারিং কার্যক্রমকে আরো বেশী গতিশীল করবে এবং যোগ্য নাগরিক তৈরিতে একজন নবাগত রোভারকে সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম)
বাংলাদেশ স্কাউটস।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
০১	স্কাউটিং সম্পর্কিত বই ও পত্র-পত্রিকা	৫
০২	বাংলাদেশ স্কাউটিং এর রূপরেখা ও বাংলাদেশ স্কাউটসের সাংগঠনিক কাঠামো	৬
০৩	এশিয়া-প্যাসিফিক রিজিওন সম্পর্কে জানা	৮
০৪	বাংলাদেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির রূপরেখা	৯
০৫	বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন	২৩
০৬	ভাষা শিক্ষা ও যোগাযোগ পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন	২৬
০৭	রেকর্ড সংরক্ষণ	২৯
০৮	পাইওনিয়ারিং ও দড়ির কাজ	২৯
০৯	কম্পাস ও মানচিত্র পাঠ	৪৩
১০	গোপন বার্তা উদ্ধার	৫২
১১	কম্পিউটার সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানার্জন	৫৪
১২	দক্ষতা অর্জন	৫৮
১৩	ধর্মীয় কার্যাবলী	৫৯
১৪	তাঁবু বাস	৬১
১৫	রোভার কুশলী ব্যাজ	৮১
১৬	শিক্ষকতা ব্যাজ	৮৫
১৭	সমাজ সেবা/সমাজ উন্নয়ন	৮৫
১৮	স্বাস্থ্য পরিচর্যা	৯৩
১৯	আত্ম উন্নয়ন	১১২

০১। স্কাউটিং সম্পর্কিত বই ও পত্রপত্রিকা পাঠ

স্কাউটিং সংক্রান্ত বই ও পত্রপত্রিকা পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে রোভার সহচর বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ফলে একজন রোভার স্কাউটের জ্ঞানের পরিসীমা বিকশিত করতে স্কাউটিং সংক্রান্ত বই ও পত্রপত্রিকা পাঠের ধারা প্রতি স্তরেই অব্যাহত রাখতে হবে। বালকদের স্কাউট শিক্ষা/ স্কাউটিং ফর বয়েজ (১৯০৮), দি উলফ কাব হ্যান্ড বুক (১৯১৬), রোভারিং টু সাকসেস (১৯২২), বাংলাদেশ স্কাউটস এবং রোভার আঞ্চলিক স্কাউটস কর্তৃক প্রকাশিত বই-পত্র, মাসিক অগ্রদূত, ত্রৈমাসিক রোভার, প্রোগ্রাম বুলেটিন, গার্ল ইন স্কাউটিং বুলেটিনসহ স্কাউটিং সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকাশনা বই ও পত্র-পত্রিকা পাঠ এই জ্ঞানের দুয়ার খুলে দিতে পারে।

০২। বাংলাদেশ স্কাউটস এর রূপরেখা, সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে জানা ঃ

(ক) বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রশাসনিক বিন্যাস ঃ

বাংলাদেশ স্কাউটস-এর সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পরিষদ জাতীয় স্কাউটস কাউন্সিল। প্রতি বছর সাধারণভাবে কাউন্সিলরবৃন্দ একবার সভায় মিলিত হয়। প্রতি তৃতীয় বছরে অনুষ্ঠিত সভাকে ত্রৈবার্ষিক কাউন্সিল সভা বলে। এই সভায় বিভিন্ন পদে নির্বাচন ও মনোনয়নের সুপারিশ করা হয়ে থাকে।

প্রধান জাতীয় কমিশনার নির্বাহী প্রধান। জাতীয় নির্বাহী কমিটি সাধারণভাবে প্রতি তিন মাসে একবার সভায় মিলিত হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস এর ১ জন সভাপতি, ৩ জন সহ সভাপতি, ১ জন কোষাধ্যক্ষ, ১৫ জন জাতীয় কমিশনার, ৩০ জন জাতীয় উপ কমিশনার, স্বেচ্ছাসেবী কর্মকর্তা এবং সার্বক্ষণিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য রয়েছে বিভাগ ভিত্তিক সার্বক্ষণিক স্কাউট এক্সিকিউটিভ। সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা কর্মীপস্থিদের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন নির্বাহী পরিচালক; এছাড়া রয়েছে যুগ্ম-নির্বাহী পরিচালক, উপ পরিচালক ও সহকারী পরিচালক পূর্ণ মর্যাদার সার্বক্ষণিক স্কাউট কর্মকর্তা।

জাতীয় সদর দফতর বাংলাদেশ স্কাউটস-এর সচিবালয়। জাতীয় স্কাউট কাউন্সিল এবং জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করেন স্বেচ্ছাসেবী কর্মকর্তাগণের দিক নির্দেশনায় সার্বক্ষণিক স্কাউট এক্সিকিউটিভ বৃন্দ।

(খ) বাংলাদেশ স্কাউটস-এর বিভিন্ন স্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

নিম্নে বাংলাদেশ স্কাউটস এর বিভিন্ন স্তরের সাংগঠনিক কমিটির রূপরেখা দেয়া হলঃ

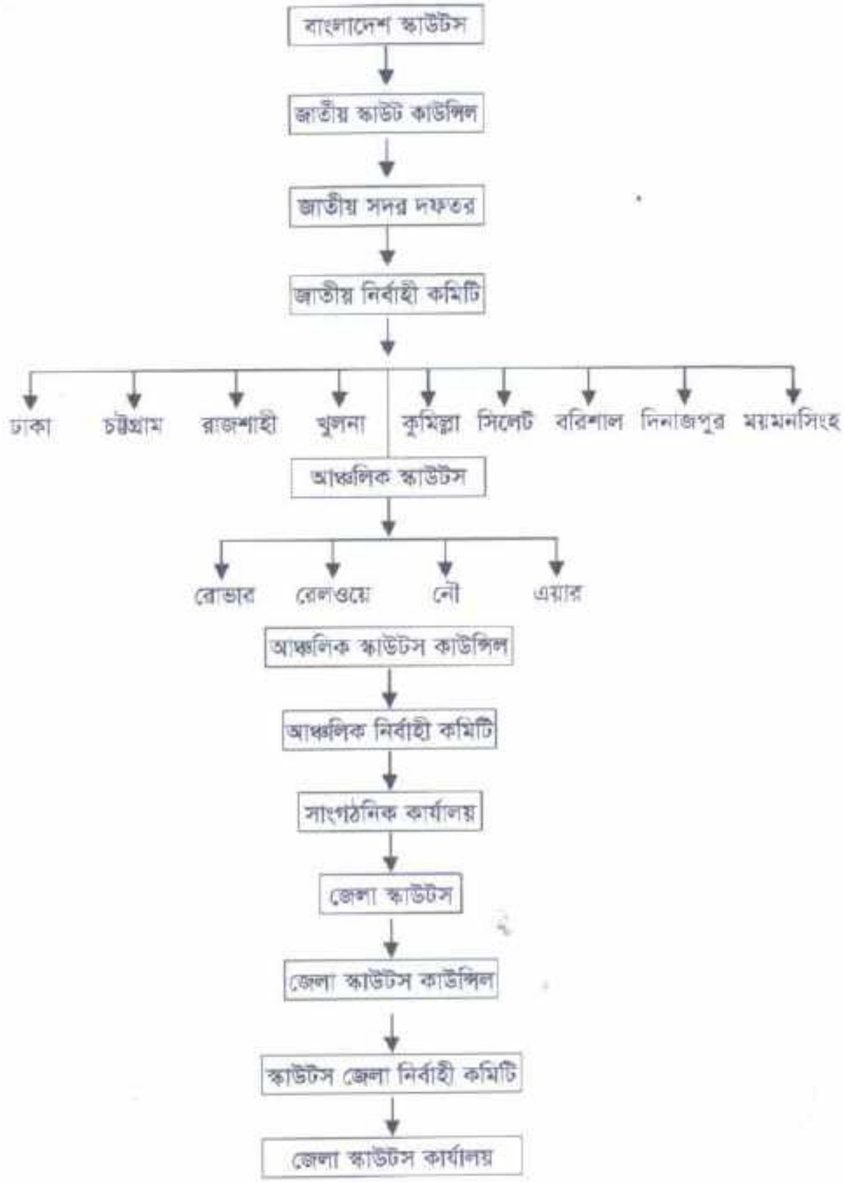

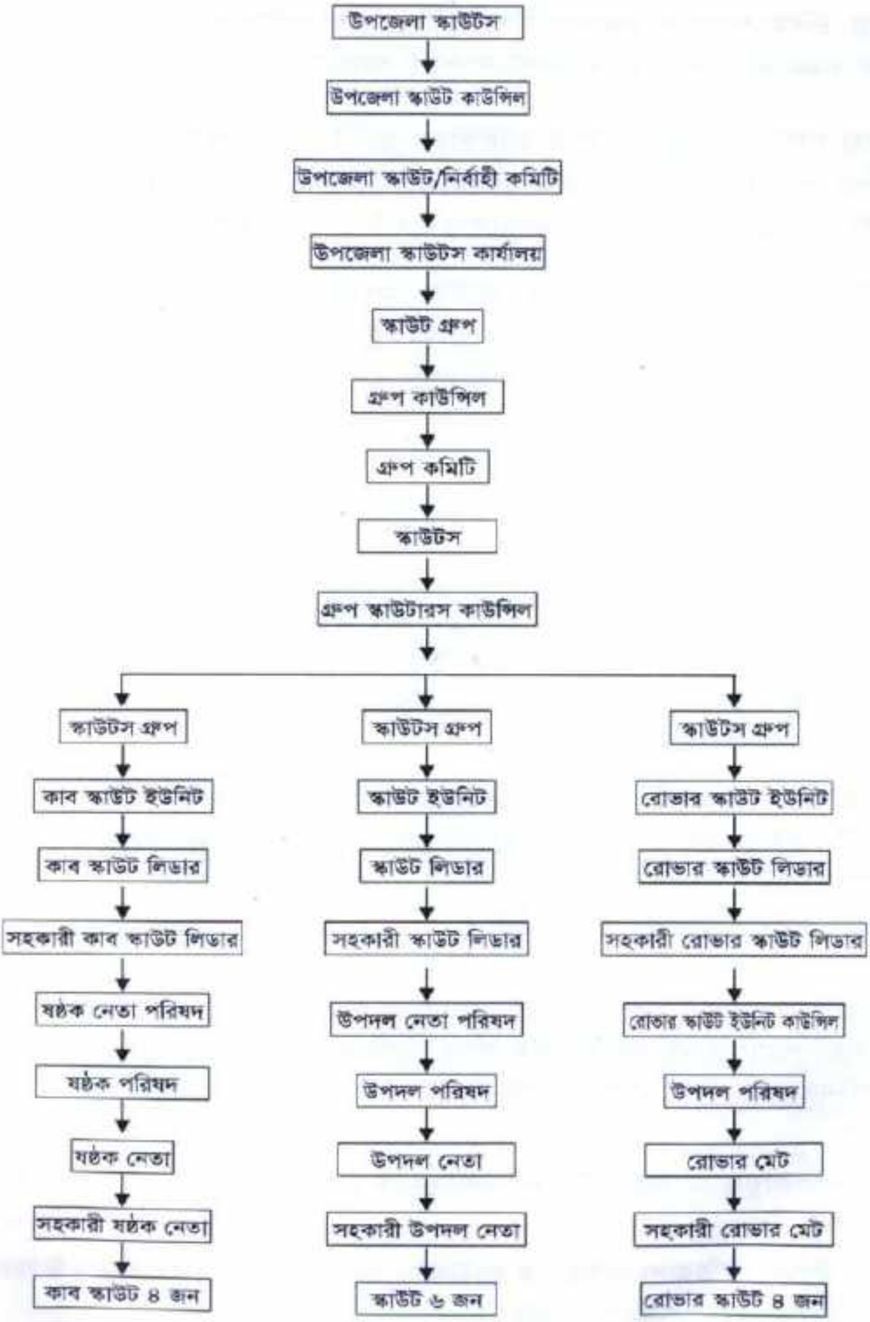
উপজেলা স্কাউটস
উপজেলা স্কাউট কাউন্সিল
উপজেলা স্কাউট/নির্বাহী কমিটি
উপজেলা স্কাউটস কার্যালয়
স্কাউট গ্রুপ
গ্রুপ কাউন্সিল
গ্রুপ কমিটি
স্কাউটস
গ্রুপ স্কাউটারস কাউন্সিল
স্কাউটস গ্রুপ
কাব স্কাউট ইউনিট
কাব স্কাউট লিডার
সহকারী কাব স্কাউট লিডার
ষষ্ঠক নেতা পরিষদ
ষষ্ঠক পরিষদ
ষষ্ঠক নেতা
সহকারী ষষ্ঠক নেতা
কাব স্কাউট ৪ জন
স্কাউটস গ্রুপ
স্কাউট ইউনিট
স্কাউট লিডার
সহকারী স্কাউট লিডার
উপদল নেতা পরিষদ
উপদল পরিষদ
উপদল নেতা
সহকারী উপদল নেতা
স্কাউট ৬ জন
স্কাউটস গ্রুপ
রোভার স্কাউট ইউনিট
রোভার স্কাউট লিডার
সহকারী রোভার স্কাউট লিডার
রোভার স্কাউট ইউনিট কাউন্সিল
উপদল পরিষদ
রোভার মেট
সহকারী রোভার মেট
রোভার স্কাউট ৪ জন

০৩. এশিয়া-প্যাসিফিক রিজিওন সম্পর্কে জানা ঃ

নিম্নে এশিয়া-প্যাসিফি অঞ্চলের সাথে তালিকাভুক্ত জাতীয় স্কাউট সংগঠনসমূহের নাম এবং এই অঞ্চলের কার্যাবলী সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যাদি প্রদান করা হল।

এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের সাথে তালিকাভুক্ত জাতীয় স্কাউট সংগঠনের নামঃ

এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের সাথে তালিকাভুক্ত ২৪টি সদস্য ও ৮টি সহযোগী সদস্য জাতীয় স্কাউট সংগঠন রয়েছে। সেগুলোর নাম নিচে দেয়া হলোঃ

সদস্য জাতীয় স্কাউট সংগঠন ঃ ১. স্কাউটস অস্ট্রেলিয়া ২. বাংলাদেশ স্কাউটস ৩. ভুটান স্কাউটস এসোসিয়েশন ৪. পারসেকুতুয়ান পেংগাকাপ নেগারা ব্রুনাই দারুস সালাম ৫. দি জেনারেল এসোসিয়েশন অব দি স্কাউটস অব চায়না ৬. ফিজি স্কাউট এসোসিয়েশন ৭. স্কাউট এসোসিয়েশন অব হংকং ৮. দি ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডস (ইন্ডিয়া) ৯. গেরাকান প্রামুকা (ইন্দোনেশিয়া) ১০. স্কাউট এসোসিয়েশন অব জাপান ১১. কিরিবিটি স্কাউট এসোসিয়েশন ১২. স্কাউট এসোসিয়েশন কোরিয়া ১৩. পারসেকুতুয়ান পেংগাকাপ মালয়েশিয়া ১৪. স্কাউটস এসোসিয়েশন অব মালদ্বীপ ১৫. স্কাউটস এসোসিয়েশন অব মোঙ্গলিয়া ১৬. নেপাল স্কাউটস ১৭. স্কাউটস নিউজিল্যান্ড ১৮. পাকিস্তান বয় স্কাউট এসোসিয়েশন ১৯. স্কাউট এসোসিয়েশন অব পাপুয়া নিউগিনি ২০. বয় স্কাউট অব দি ফিলিপাইন ২১. সিঙ্গাপুর স্কাউট এসোসিয়েশন ২২. শ্রীলংকা স্কাউট এসোসিয়েশন ২৩. ন্যাশনাল স্কাউট অর্গানাইজেশন অব থাইল্যান্ড ২৪. মিয়ানমার স্কাউট ২৫. কমবোডিয়া স্কাউট।

সহযোগী সদস্য জাতীয় স্কাউট সংগঠন ঃ দি স্কাউট এসোসিয়েশন অব ম্যাকাও, পশ্চিম সামোয়া, টুভালু, কুক দ্বীপপুঞ্জ, নাউরু, নিউক্যালিডোনিয়া, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ও টোংগা। * জুন ২০১৬ ইং পর্যন্ত।

এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের কার্যাবলী ঃ

কাজের সুবিধা এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য বিশ্ব স্কাউট সংস্থাকে ছয়টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল উক্ত ছয়টি অঞ্চলের একটি এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল তার সাথে তালিকাভুক্ত বিভিন্ন জাতীয় স্কাউট সংগঠনসমূহের সাথে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখে নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে।

(১) তালিকাভুক্ত জাতীয় স্কাউট সংগঠনসমূহকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপদেশ প্রদান করা।

(২) প্রশিক্ষণ নীতিমালা নির্ধারণ ও জাতীয় স্কাউট সংগঠনের অনুরোধক্রমে উচ্চতর প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা।

(৩) এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের জাম্বুরী, কনফারেন্স, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ইয়ুথ ফোরাম অনুষ্ঠান আয়োজন ও পরিচালনা করা।

(৪) সদস্য জাতীয় স্কাউট সংগঠনসমূহের সাথে পত্র যোগাযোগ করে সম্পর্ক উন্নয়ন করা।

(৫) স্কাউটিং সম্পর্কীয় বই, বুলেটিন, পত্রিকা, হ্যান্ডবিল, লিফলেট ইত্যাদি প্রকাশ করা।

(৬) স্কাউটিং-এর উপর গবেষণা করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল সদস্য জাতীয় স্কাউট সংগঠনসমূহে প্রেরণ করা।

(৭) সদস্য জাতীয় স্কাউট সংগঠনের কাছ থেকে বার্ষিক পরিসংখ্যান ও বার্ষিক প্রশিক্ষণ কার্যাবলী রিপোর্ট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করে তা সমন্বয় করে বিশ্ব স্কাউট সংস্থায় প্রেরণ করা।

০৪. বাংলাদেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির রূপরেখা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ঃ

(ক) বাঙ্গালী জাতির অভ্যুদয় ঃ

বর্তমান বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী বহুকাল ধরে নানা জাতির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। এর মূল কাঠামো সৃষ্টির কাল প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মুসলমান অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। সমগ্র বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (ক) প্রাক-আর্য বা অনার্য নরগোষ্ঠী এবং (খ) আর্য নরগোষ্ঠী। এদেশে আর্যদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত অনার্যদেরই বসতি ছিল এবং এই প্রাক-আর্য নরগোষ্ঠী বাঙ্গালী জীবনের মেরুদন্ড। আর্যদের আগমনে সে জীবন উৎকর্ষ মন্ডিত হয়ে উঠে।

বৈদিক যুগে আর্যদের সাথে বাংলাবাসীর কোন সম্পর্ক ছিল না। বৈদিক গ্রন্থাদিতে বাংলার নর-নারীকে অনার্য ও অসভ্য বলে উলেখ করা হয়েছে। বাংলার আদিম অধিবাসী আর্যজাতি থেকে উদ্ভূত হয়নি। আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠী মূলতঃ নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোটচীনীয়-এই চার শাখায় বিভক্ত ছিল। নিগ্রোদের মত দেহগঠনযুক্ত এক আদিম জাতির এদেশে বসবাসের কথা অনুমান করা হয়। কালের পরিবর্তনে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এখন বিলুপ্ত। অস্ট্রিক গোষ্ঠী থেকে বাঙ্গালী জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে বলে মনে করা হয়। কেউ কেউ তাদের 'নিষাদ' জাতি বলেন। প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার বছর পূর্বে ইন্দোচীন থেকে আসাম হয়ে বাংলায় প্রবেশ করে অস্ট্রিক জাতি নেগ্রিটোদের উৎখাত করে। এরাই কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি উপজাতির পূর্ব পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত। বাঙ্গালী রক্তে এদের প্রভাব আছে। বাংলা ভাষায় ও বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে এর প্রভাব বিস্তার করেছে।

অস্ট্রিক জাতির সমকালে বা কিছু পরে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে দ্রাবিড় জাতি এদেশে আসে এবং সভ্যতায় উন্নততর তারা অস্ট্রিক জাতিকে গ্রাস করে। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণেই সৃষ্টি হয়েছে আর্যপূর্ব বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী। এদের রক্তধারা বর্তমান বাঙ্গালী জাতির মধ্যে প্রবাহমান। অস্ট্রিক দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর মিশ্রণে যে জাতির প্রবাহ চলেছিল, তার সঙ্গে আর্য জাতি এসে সংযুক্ত হয়ে গড়ে তুলেছে বাঙ্গালী জাতি। এর জন্য প্রাক-আর্য আদিম জাতি বাঙ্গালী জনসাধারণের তিন চতুর্থাংশ অধিকার করে রয়েছে। বাংলা ভাষা ও গ্রামীণ জীবনে এদের স্পষ্ট প্রভাব থাকলেও বাংলাদেশে আর্য অভিযানের পর অস্ট্রিক-দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী আর্য ভাষা ও জীবন ধারার সঙ্গে মিশে গেছে। অস্ট্রিক-দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে মঙ্গোলীয়রা বা ভোটচীনীয় গোষ্ঠীয় জনসমষ্টির সংমিশ্রণ ঘটে। বাংলাদেশে আর্যীকরণের পরেই এদের আগমন ঘটে বলে বাঙ্গালী রক্তের সঙ্গে এদের মিশ্রণ উলেখযোগ্য নয়, বাংলার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তে এদের অস্থিত্ব রয়েছে। গারো, কোচ, ত্রিপুরা, চাকমা ইত্যাদি উপজাতি এই গোষ্ঠিভুক্ত। মেন্তর্য বিজয় থেকে গুপ্তবংশের অধিকার পর্যন্ত অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ থেকে খ্রীষ্টীয় ৫০০ অব্দ পর্যন্ত সময়ে মোট আটশ' বছর ধরে বাংলাদেশে ক্রমে ক্রমে আর্যীয়করণের পালা চলে। তবে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তযুগেই বাংলাদেশে আর্য ভাষা ও সংস্কৃতি চালু হয়। আর্যরা বৃবর্ত ত্যাগ করে প্রথমে আর্যবর্তে বা উত্তর ভারতে আগমন করে এবং পরে মৃ অঙ্গ মিথিলা রাড় বঙ্গে নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দিকে সেমীয় গোত্রের আরবীয়রা ইসলাম ধর্ম প্রচার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়। তাদের অনুসরণে নেগ্রিটো রক্তবাহী হাবশীরাও এদেশে আসে।

এমনিভাবে অন্ততঃ দেড় হাজার বছরের অনুশীলন গ্রহণ-বর্জন ও রূপান্তরীকরণের মাধ্যমে বাঙ্গালী জনজীবন গড়ে উঠেছে। তাই বর্তমান বাঙ্গালী জাতি অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-আর্য-মঙ্গোলীয়-সেমীয়-নিগ্রো ইত্যাদি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর রক্তধারার সংমিশ্রণে এক বিচিত্র জনসমষ্টি হিসেবে বিদ্যমান।

এদেশে আর্যধর্ম বিস্তারের আগে বাংলার ধর্মমত সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ মিলে না। আর্য সভ্যতার সংস্পর্শে এদেশে বৈদেশিক ধর্মের প্রচলন হয়। গুপ্ত যুগে এদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও তান্ত্রিক মতবাদের ব্যাপক প্রসার শুরু হয়। অষ্টম শতক থেকে বৈষ্ণব ধর্মের সম্প্রসারণ ঘটে। গুপ্ত যুগে শৈব ধর্মের প্রচলন ছিল। প্রাচীনকালে বাংলায় শক্তি মতও প্রচলিত ছিল। পাল রাজাদের আমলে বেন্তদ্ধ ধর্ম পুনরায় ব্যাপকতা লাভ করে। পাল যুগের পর এদেশে বেন্তদ্ধ ধর্ম সহজিয়া ধর্মরূপে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সহজিয়া ধর্মমতের আচার্যগণ সিদ্ধাচার্য নামে পরিচিত। সেন রাজাদের

আমলে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম প্রবল রূপ ধারণ করে। তবে মুসলমানদের আগমনের সাথে সাথে এদেশে ইসলাম ধর্মের সম্প্রসারণ ঘটে। পর্তুগীজ ও ইংরেজ আগমনে এদেশে প্রচলিত হয় খ্রীষ্টধর্ম। এভাবে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মমতের জনগোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটেছে। বাংলা সাহিত্য হচ্ছে তার বিচিত্র প্রতিফলন।

বাংলার প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে বাঙ্গালীর উন্নত নৈতিক চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে প্রাচীন সাহিত্যে ব্যভিচার ও উচ্ছৃংখলতার চিত্রও আছে। দোষক্রটি থাকা সত্বেও চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়েন সাং বাঙ্গালীর উদ্যমশীলতা, সাহসিকতা ও বিদ্যোৎসাহিতার প্রশংসা করেছেন।

সূত্রঃ অধ্যাপক মাহবুবুল আলম কর্তৃক লিখিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।

(খ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঃ

পাকিস্তান সৃষ্টি হয় ১৯৪৭ সালের অগাস্ট মাসে। আর ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে চক্রান্ত শুরু হয় বাংলাভাষার ওপর। চলতে থাকে বাংলা ভাষা সমর্থক আন্দোলনকারীদের উপর সরকারের নানারূপ হামলা ও নির্যাতন। এই হামলা ও নির্যাতনের ফল হয় বিপরীত। বাঙ্গালীরা এই আন্দোলনের প্রতি জোর সমর্থন প্রদান করে।

১৯৪৮ সালের ১১ জানুয়ারি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব আব্দুল রব নিশতার সিলেট সফরে গেলে সিলেট মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি জনাব আব্দুস সামাদের নেতৃত্বে ছাত্র প্রতিনিধিদল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে পূর্ব বাংলার শিক্ষার মাধ্যম ও আদালতের ভাষারূপে বাংলার ব্যবহার দাবী করেন।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয়ার্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব আর্টস এবং সায়েন্স এক যুক্ত বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত সকল স্কুল কলেজে নিম্নতম আই এ পর্যন্ত ক্লাসেই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা হবে। ১৯৫০-৫১ সেশন থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে বলে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি করাচীতে গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। ঐ সভায় বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের বিষয়টি তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানি সদস্যগণ আবেদন জানালে তা প্রত্যাখাত হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব গাফফার আলী খান প্রস্তাব করেন যে, পাকিস্তানের একটি মাত্র ভাষা থাকবে। আর সেই সাধারণ ভাষাটি হবে উর্দু। গণ পরিষদের সিদ্ধান্ত ও মুসলিম লীগের বাংলাভাষা বিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ, মতান্তরে ২৯

ফেব্রুয়ারি। ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে ভাষণদান কালে পাকিস্তানের গর্ভনর জেনারেল কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। গর্ভনর জেনারেল কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর এই ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া জন্ম দেয়।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের চরম পরিণতি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রথম সোপান হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

তদানিন্তন পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানীদের কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য আওয়ামী লীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ আনে। পূর্ব পাকিস্তানি জনসাধারণ এই মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে প্রচন্ড গণআন্দোলন শুরু করে। সরকার বাধ্য হয়ে এই মিথ্যে মামলা প্রত্যাহার করে নেন। এই আন্দোলনকে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের দ্বিতীয় সোপান হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৯৬৯ সালে পাকিস্তান সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। আওয়ামী লীগ ৬ দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করে পূর্ব পাকিস্তানি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে ঐ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী আওয়ামী লীগকে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করতে দিতে রাজি ছিল না। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে এক ব্যাপক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। পূর্ব পাকিস্তানি জনগণ আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের এহেন আচরণের তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তোলে। এই আন্দোলনকে বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের তৃতীয় সোপান হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্র সমাজের বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিলসহ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বশাসন, প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে পার্লামেন্টারি শাসন প্রতিষ্ঠা, বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ, কৃষক ও শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা দান রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি ইত্যাদি দাবীর সমন্বয়ে ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ছাত্র সমাজের এই ১১ দফা কর্মসূচি জনতা দ্বারা ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয়েছিল, যা পরবর্তীতে 'গণঅভ্যুত্থান'এর রূপ নেয়।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয় এই জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের উদ্দেশ্য স্বাধীনতার ডাক দিয়ে বলেন **"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"**

১৬ই মার্চ থেকে ২৫ এ মার্চ পযর্ন্ত ইয়াহিয়া খানের সাথে আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ আলোচনা করেন। সব আলোচনা ব্যর্থ করে দিয়ে ২৫ এ মার্চ কালো রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অসংখ্য ছাত্র, শিক্ষক, ইপিআর ও সাধারণ নারী ও পরুষকে হত্যা করে। এ কালা রাতেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের আগে অর্থাৎ ২৬ এ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু ওয়্যারলেস বার্তায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষনা দেন। এর ভিত্তিতে ২৬ এ মার্চ শুরু হয় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম।

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। এ সরকার মুজিব নগর সরকার নামে পরিচিত। বঙ্গবন্ধু হলেন স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। এই সরকার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনে জনগণকে উৎসাহিত করে এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুক্তিবাহিনী গঠন করে। মুক্তিবাহিনীতে সকল শ্রেণি পেশার বাঙালিদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠিরাও অংশগ্রহন করেছিলেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ চলে। এ যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহিদ হন, অসংখ্য মানুষ পঙ্গু হন, অনেকেই ঘরবাড়ি হারান। রাজাকার -আলবদর নামে পরিচিত কিছু সংখ্যক বাঙালি পাকিস্তানিদের পক্ষে হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও বর্বর নির্যাতন চালায়। তারা যুদ্ধপরাধী । তাদের বর্বর ও নির্যতন পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুর গণহত্যা মুক্তিবাহিনীকে দমাতে পারেনি। অবশেষে বাংলাদেশের স্বাধীন হয়। এবং স্বাধীন ভূ-খন্ডের পাশাপাশি আমরা পাই একটি মানচিত্র, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত।

স্বাধীনতা দিবস

স্বাধীনতা দিবস একটি দেশের গৌরব ও তাৎপর্যময় দিন। ২৬ শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস। এই দিনটিকে বাংলাদেশের জাতীয় দিবস হিসাবে উদযাপন করা হয় এবং সরকারী ভাবে এই দিনটিকে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

(গ) বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ঃ

মানব সমাজে প্রচলিত আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, চলন-বলন প্রভৃতি সমন্বয়ে যে পরিবেশ গড়ে ওঠে তাকেই সংস্কৃতি বলে। মিঃ ই.বি. টেলরের মতে, "সমাজের সদস্যরূপে মানুষ যে সব অভ্যাস ও দক্ষতা লাভ করে এবং যে সব জ্ঞান, বিশ্বাস,শিল্প নৈপুণ্য, নৈতিকতাবোধ, আইন ও আচার-আচরণ গড়ে তোলে, তার সবকিছু মিলে যে একটি জটিল পূর্ণরূপ প্রকাশ পায় তাই সংস্কৃতি"। মানুষ প্রকৃতি থেকে প্রচুর দান পেয়েছে। এসব দানকে কাজে লাগিয়ে বেঁচে থাকার জন্য তাকে আরো কতকগুলো কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এই কৌশল অবলম্বনের যে বৈশিষ্ট্য তাই সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি একটি জাতীয় প্রাণসত্ত্বার কর্মময় ও চিন্ময় অভিব্যঞ্জক। সংস্কৃতির তারেই বেজে ওঠে একটি জাতির মর্মধ্বনি। বহু প্রাচীনকাল থেকে একটি গৌরবময় ইতিহাস বাংলাদেশের সংস্কৃতি জীবনকে জড়িয়ে রেখেছে। যে সংস্কৃতি বা সভ্যতা অন্য দেশের মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে তাই বরণীয় সংস্কৃতি। বাংলাদেশ সেরূপ একটি বিশেষ সংকৃতির অধিকারী। বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানব জীবনে এমন কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যাতে এখানকার নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

বাংলাদেশের প্রাকৃতি ও মানব জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে এখানকার সংস্কৃতিক জীবন ধারার বিকাশ ঘটেছে। সহজ ও সরল জীবনের অধিকারী বাংলাদেশের মানুষ। তাই কাব্য চর্চা ও শিল্প চর্চা এদেশে আদিকাল থেকে বিরাজমান। আদিকাল থেকে এই দেশে সাহিত্যে গীতিপ্রবনতা ও সঙ্গীতের প্রধান্য দেখা যায়। লোকনৃত্য, শিল্প ও সাহিত্য একটি আধ্যাত্মিকতার ছাপ দেখা যায়। বাংলাদেশের বাউল, মুর্শিদী, মারফতি, লালনগীতি, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া পল্লীগীতি ইত্যাদি গানের মধ্যে বাংলাদেশের মানুষের অন্তরের সুরটি ধ্বনিত হয়। কবি গান, যাত্রা, জারী, ঘাটু, পালাগান ইত্যাদি বাংলাদেশের অবদান। এখানে লোক সাহিত্যের সার্থক বিকাশ ঘটেছে। ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার অসংখ্য পালাগান ছাড়াও অনেক পালাগান পলীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে। এই সমস্ত পলী গাঁথায় অশিক্ষিত পলী কবির কণ্ঠে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের, যেমন প্রশস্তি গীতি দুই একটি গানে অল্প অল্প কথা ফুটে উঠেছে। তেমনি ফুটে উঠেছে মানব মনের অতলান্ত রহস্য। এই ধারাটি আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে বিদ্যমান আছে। জনসাধারণের জন্য প্রচলিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর অসংখ্য ছড়া সরলতার প্রকাশ মাধুর্যে ও বিচিত্র উপলব্ধির সুর আকারে সকলের অনুভূতির তারে একই সঙ্গে শিক্ষা ও আনন্দের গান বাজিয়ে যায়।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে আছে লোক সংস্কৃতির আর একটি দিক। এই লোক সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে কৃষিজীবীদের সংস্কৃতি। সব রকমের গঠন কাজে, চিত্রশিল্পের কারুকাজে, পুতুল তৈরির পটুতায়, বিভিন্ন জিনিস দিয়ে অলংকার গড়ার চাতুর্যে একটি বাস্তব সংস্কৃতিক জীবন বাংলাদেশে বহু আগে থেকেই আছে। বাংলাদেশের তৈরি বাঁশ ও বেতের কাজের দ্রব্যাদি আজ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। গ্রাম্য শিল্পের মধ্যে পোড়ামাটির তৈরি বিভিন্ন দ্রব্যাদি, কাঠের তৈরি পুতুল আরও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ঢাকার শাঁখার কাজ, রূপার তারের কাজ, জামালপুরের অন্তর্গত ইসলামপুরের কাশার বাসন, ঢাকার ফুল তোলা কাপড়, টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ী, কুমিলার ময়নামতি শাড়ী, রাজশাহীর মটকা, সিলেটের শীতল পাটি প্রভৃতি আজ বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। জেলে নৃত্য, ফসল কাটার নৃত্য ইত্যাদির মধ্যে এই দেশের সাংস্কৃতিক পরিচয় পাওয়া যায়। সম্প্রতি লোক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে লোকনৃত্যের বিকাশ ঘটেছে প্রবলভাবে। বাংলাদেশে বসবাসরত অনেক উপজাতি সম্প্রদায় তাদের স্ব স্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে এদেশের সংস্কৃতি অঙ্গনকে বহু গুণে সমৃদ্ধ এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তুলেছে।

দেশের সাংস্কৃতিক জীবনকে উচ্চতর ভাবমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার সোপান হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষা বিস্তারমূলক প্রচেষ্টার ফলে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা ও গবেষণা চলছে। বাংলাদেশ চারুকলা ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আদর্শগত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। অন্ধভাবে বিদেশী সংস্কৃতিক ধারা অনুসরণ না করে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যদি সাংস্কৃতিক জীবনে রূপায়িত করা যায় তবে তা যথার্থ সার্থকতা লাভ করবে এবং অন্যের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারবে বলে বিশ্বাস করা যায়। বিশ্ববাসীর চোখে নব নব সংস্কৃতি দিয়ে বাংলাদেশ স্মরণীয় হয়ে উঠুক বাঙ্গালী জাতির এই কামনা।

(ঘ) বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ঃ

প্রায় ২০০ বছর শাসন করে ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান পৃথক পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত করে ব্রিটিশ সরকার। বাংলাদেশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তান অংশে অবস্থান করে। বর্তমান পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে পূর্ব পাকিস্তান বলে অবহিত করা হতো। পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই ভাষা দিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। তৎকালীন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ (৫৬%) জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা ছিল বাংলা। পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে উর্দু ও ইংরেজী ভাষার সাথে বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে এবং ২৪ মার্চ কার্জন হলে ঘোষণা করেন-" উর্দু এবং একমাত্রই উর্দু হবেই পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা (Urdu and only Urdu shall be the state Language of Pakistan.) রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ১৯৫০ সালের ১১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। যখন রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবী চূড়ান্ত রূপ নেয় তখন থেকে ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। তাদের অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনকে বানচাল করতে পাকিস্তান সরকার ২০ ফেব্রয়ারি থেকে ৩০ দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করেন। এই নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' ২১ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে হরতাল ডাকে। এই হরতালকে সফল করতে আপামর ছাত্র-জনতা রাষ্ট্রভাষার দাবীতে মিছিল বের করে। এই মিছিল বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে গেলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিরীহ ছাত্র-জনতার উপর গুলি বর্ষন করে। এতে শহীদ হন রফিক, সালাম, জব্বার সহ অনেক নাম না জানা মেধাবী তরুণ। তাঁদের স্মরণে ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রথম শহীদ মিনার শহীদ শফিউরের পিতা মাহবুবুর রহমান উন্মোচন করেন। কিন্তু ২৪ ফেব্রুয়ারি পুলিশ সে শহীদ মিনার ভেঙ্গে দেয়। আরো আন্দোলনের পথ পরিক্রমার পর ১৯৫৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ঃ

আমরা পূর্বেই জেনেছি রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা ভাষা রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বিশ্বের বাংলা-ই একমাত্র ভাষা যা রক্তের বিনিময়ে এসেছে। এই ভাষার তাৎপর্য বিশ্ব পরিমন্ডলে ছড়িয়ে পড়েছে। জাতীয় পর্যায়ে ২১ ফেব্রুয়ারি কে তাৎপর্য মন্ডিত করতে ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বরে সৃষ্টি হয় বাংলা একাডেমি। ১৯৭৬ সালে প্রবর্তন করা হয় অমর একুশে পদক। ২০০১ সালে ঢাকার সেগুন বাগিচায় স্থাপন করা হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট।

বিশ্বে মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্থান চতুর্থ এবং দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে দশম অবস্থানে রয়েছে। মাতৃভাষার জন্য রক্তদানের এই ত্যাগ বিশ্বে একবারই ঘটেছে। তাই ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর UNESCO ২১ ফেব্রুয়ারি কে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ২০০০ সাল থেকে বাংলাদেশের সাথে বিশ্বের সকল দেশে এই দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হচ্ছে।

(ঙ) বাংলাদেশে বসবাসরত যে কোন একটি উপজাতীয় সম্প্রদায়ের ভৌগোলিক অবস্থান, জীবন ধারণ, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর ঃ বাংলাদেশে বসবাসরত কয়েকটি উপজাতীয় সম্প্রদায়ের ভৌগোলিক অবস্থান, জীবন ধারণ, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর বিবরণ অতি সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হলো। বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন উপজাতীয়দের সম্পর্কে আরো বেশি জানার জন্য জনাব আব্দুস সাত্তার রচিত "অরন্য জনপদে" বইটি সহ অন্যান্য বই পড়ার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

গারো ঃ

গারো উপজাতির অধিকাংশই ভারতের আসাম (মেঘালয়) এবং বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলায় বসবাস করে। এছাড়া বৃহত্তর ঢাকা জেলার উত্তরে বৃহত্তর রংপুর জেলার, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এবং বৃহত্তর সিলেট জেলার চা বাগানে সামান্য কিছু গারো উপজাতীয় লোক দেখা যায়।

বাংলাদেশে বসবাসরত গারোরা মূলতঃ পাহাড়ী গারো নয়। এরা সমতলী গারো নামে পরিচিত। কিছু কিছু টিলা বাঁ উচু টিবি বিশিষ্ট বনাঞ্চলে গারো উপজাতীয়দের বসবাস। বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় আনুমানিক ৫০,০০০ টাঙ্গাইল জেলায় মধুপুরে ২০,০০০ এবং বৃহত্তর সিলেট জেলায় ১০,০০০

সিলেট জেলায় ১০,০০০ গারো বাস করে। গারোদের ভাষা হচ্ছে মান্দি ভাষা বা গারো ভাষা। এই ভাষার কোন পৃথক বর্ণমালা নেই।

নরগোষ্ঠীগতভাবে গারোরা মঙ্গোলয়েড। তাদের মধ্যে বাংলাদেশে বসবাসরত গারোদের ৯০% ধর্মান্তরিত খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী। গারোদের মধ্যে বর্তমানে প্রায় ২% হিন্দু এবং মুসলমান। বাকি ৮% এর মধ্যে ঐতিহ্যবাহী ধর্মই প্রাধান্য পাচ্ছে। গারোদের ধর্মের নাম সংসারেক। এর অর্থ স্পষ্ট নয়। গারোরাও এর অর্থ জানে না।

গারো উপজাতীয়দের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা চালু আছে। অর্থাৎ গারো উপজাতীয় সম্প্রদায়ের সম্পত্তি ও বংশের নাম মাতৃধারায় মাতা থেকে মেয়েতে বর্তায়। গারো দম্পতি স্ত্রীর বাবার গৃহে বাস করে। তবে ইদানিং কিছু কিছু শিক্ষিত গারো উপজাতি দম্পতি স্বামীর পিতার গৃহে বসবাস করে। পরিবারের ক্ষমতা তাত্ত্বিকভাবে স্ত্রীর হাতে ন্যস্ত। পরিবারের সকল সম্পত্তির মালিক স্ত্রী। তবে সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পুরুষের হাতে ন্যস্ত। তাই সম্পত্তি বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই যৌথভাবে গ্রহণ করতে হয়। পরিবারের যে সম্পত্তি আছে তার মালিক হচ্ছে স্ত্রী। কোন মহিলার যতগুলি কন্যাই থাকুক না কেন তার সম্পত্তির মালিক হবে পরিবারের যে কোন একজন কন্যা। সাধারণত কনিষ্ঠ কন্যাই মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। যে কন্যা মাতার সম্পত্তি অর্জন করে তাকে বলা হয় 'নোকনা'। মহিলার যে সব কন্যা মাতার সম্পত্তির ভাগ পায় না তাদেরকে বলা হয় 'এগেট'। 'এগেট' অর্থ অ-উত্তরাধিকারী। 'নোকনার' পিতা-মাতাই নোকনার জন্য পাত্র বা স্বামী পছন্দ করে। নোকনার স্বামীকে বলা হয় 'নোকরম'। 'নোকনা' এবং 'নোকরম' বাবা মার বাড়ীতে বসবাস করে বা বসবাস করতে হয়। 'নোকনার' এবং 'নোকরম' বৃদ্ধ মা-বাবার সেবা করতে বাধ্য। 'এগেট' এর স্বামীদের চাওয়ারী বলা হয় অর্থাৎ জামাই। এগেটের বাবা-মার বাড়ীতে চাওয়ারীরা অস্থায়ীভাবে বসবাস করে এবং নিজেদের বাড়ীঘর তৈরি করতে পারলে ভিন্ন বাড়ীতে চলে যায় এবং যেতে বাধ্যও বটে।

গারো বিয়েতে কন্যাকে কোন পণ দিতে হয় না। স্বামীও কোন যৌতুক পায় না। গারোদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ খুবই কম। বিবাহ বিচ্ছেদ শালিসের মধ্যে ঘটে। বিবাহ বিচ্ছেদে স্বামী বা স্ত্রীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। দোষী ব্যক্তির গোষ্ঠী অন্যপক্ষকে জরিমানা দেয়ার শর্তে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। গারো উপজাতীয় সম্প্রদায় আগে ''জুম'' বা পালাক্রম চাষ করত। সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে বর্তমানে গারোরা হাল কৃষিতে অভ্যস্ত হয়েছে।

যদিও গারো গ্রাম সমাজে গ্রাম প্রধানদের অস্থিত্ব বরাবরই ছিল তথাপি চাকমাদের

মতো গারো উপজাতীয় প্রধান গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে গ্রামীণ বিচার আচার পরিচালনা করেন। গারোদের মধ্যে শিক্ষিতের হার বর্তমানে ২০%।

চাকমা ঃ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বেশি চাকমা উপজাতীয় সদস্যরা বসবাস করে। এই তিনটি জেলার মধ্যে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় সবচেয়ে বেশি চাকমা বসবাস করে। জনসংখ্যার দিক থেকে চাকমা উপজাতীয়রাই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উপজাতি। বয়স্ক চাকমারা নিজেদের জন্য চাকমা নামই ব্যবহার করেন। পক্ষান্তরে চাকমা সমাজের বৃহত্তর গ্রামীণ জনগোষ্ঠী 'চাঙমা' নামেই নিজেদের পরিচয় দেন।

বর্তমানে চাকমারা একটি বাংলা উপভাষায় কথা বলে। তারা বাংলা হরফে ঐ উপভাষা লেখে। চাকমাদের মধ্যে মঙ্গোলয়েডের যথেষ্ট মিল।

চাকমারা বর্তমানে প্রধানতঃ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তারা বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করে। চাকমা পরিবার পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। পরিবারের সকল ক্ষমতা চাকমা পুরুষের হাতে। সম্পত্তি বা বংশ পরিচয় পিতা থেকে পুত্রে বর্তে।

চাকমা সমাজে বহু স্ত্রী বিবাহ অনুমোদিত। একজন স্বামী কতজন মহিলা বিবাহ করতে পারবে তার সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। চাকমা সমাজে বিধবা বিবাহও অনুমোদিত। চাকমা উপজাতিতে আন্তঃবিবাহ এবং বহির্বিবাহ উভয়ই প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ একজন চাকমা যুবক চাকমা সমাজেই বিবাহ করে। চাকমা বিয়েতে বর কন্যার বাড়ীতে যায় না। বর পক্ষের লোকজন কন্যার বাড়িতে গিয়ে কন্যাকে বরের বাড়ীতে তুলে নিয়ে আসে। বরের বাড়ীতেই বিয়ের সামাজিক অনুষ্ঠানাদি পালিত হয়। অধিকাংশ চাকমা বিবাহ ঐতিহ্যবাহী চাকমা রীতি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়। বিয়েতে উপস্থিত সকল চাকমার অনুমতি প্রয়োজন হয়। চাকমা বরেরা কোন যৌতুক পায় না। বিয়ের পর চাকমা দম্পত্তি স্বামীর পিতার গৃহে বা স্বামীর নিজ বাড়ীতে বসবাস করে।

চাকমা সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ খুব কমই ঘটে। বিবাহ বিচ্ছেদ একান্ত জরুরী হয়ে পড়লে সালিশ বসে। স্ত্রী দোষী হলে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দেয়া পোশাক ও গহনাপত্র

দাবি করতে পারে। অপর পক্ষে স্বামী দোষী হলে তাকে জরিমানা দিতে হয়। এভাবে সালিশের মাধ্যমে চাকমা সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে।

চাকমা পারিবারিক সংগঠনের চেয়ে বৃহৎ সংগঠন হলো পাড়া বা আদাম। ব্যস্ত কতকগুলি চাকমা পরিবারগুচ্ছ নিয়েই গঠিত হয় আদাম। আদাম আবার ক্ষুদ্রতম চাকমা প্রশাসনিক এককেরও নাম। আদামের প্রধানকে বলা হয় 'কারবারী'। কারবারী নিয়োগ করেন চাকমা রাজা। তবে চাকমা রাজা মৌজা প্রধানের (কতিপয় আদাম নিয়ে গঠিত হয় মৌজা বা গ্রাম) সাথে আলোচনা করেই 'কারবারীর' উপযুক্ত ছেলেকে প্রায়ই কারবারী হিসাবে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। কারবারীর কাজ হলো আদামের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা এবং শালিস বিচার কাজে মেন্তজা প্রধানকে সাহায্য করা। আদামের সবাই মিলে ধর্মীয় ও বৈবাহিক উৎসব অনুষ্ঠান পালন করে ও যৌথভাবে কৃষি কাজে অংশ নেয়। 'কারবারী'র কোন বেতন ভাতা নেই। তিনি আদামের সদস্যদের সম্মান পান এই যা।

কতকগুলি চাকমা আদাম মিলে গঠিত হয় চাকমা গ্রাম বা মেন্তজা। মেন্তজা প্রধানকে বলা হয় 'হেডম্যান'। চাকমা রাজার সুপারিশক্রমে জেলা প্রশাসক 'হেডম্যান' নিযুক্ত করেন। হেডম্যানের যোগ্য পুত্র থাকলে তাকেই 'হেডম্যান' করা হয়। হেডম্যানের কাজ হলো মেন্তজা বা গ্রামের শান্তি শৃংখলা রক্ষা করা। সালিশের মাধ্যমে গোলযোগ নিস্পত্তি করাও তার কাজ। হেডম্যানের অন্যতম প্রধান কাজ হলো খাজনা আদায় করা। 'হেডম্যানরা' ইতিপূর্বে তাঁদের কাজের জন্য কোন বেতন ভাতা পেতেন না। তিনি কেবল কিছু পরিমাণ জমির খাজনা মওকুফ পেতেন এবং আদায়কৃত খাজনার একটি নির্দিষ্ট অংশ কমিশন হিসেবে পেতেন। এছাড়া সালিশি জরিমানার একটি অংশও তিনি পান। কয়েক বছর আগে থেকে হেডম্যান উল্লিখিত সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি মাসিক ১০,০০০ হারে ভাতা পাচ্ছেন।

'হেডম্যানরা' হাল কৃষি জমি থেকে আদায়কৃত খাজনা জেলা প্রশাসক অফিসে জমা দিয়ে জমাকৃত টাকার উপর একটি নির্দিষ্ট অংশের কমিশন লাভ করেন। পক্ষান্তরে পাহাড়ী জুম জমি থেকে আদায়কৃত খাজনার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ নিজে রেখে বাকিটা চাকমা রাজাকে প্রদান করেন। চাকমা রাজা আবার তা থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নিজে রেখে বাকিটা সরকারকে বুঝিয়ে দেন।

চাকমা সমাজের কয়েকশত মেন্তজা বা গ্রাম নিয়ে গঠিত হয় চাকমা সার্কেল। চাকমা সার্কেলের প্রধান হলেন চাকমা রাজা। চাকমা রাজা তার সার্কেল তথা চাকমা সমাজের শান্তি শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করেন চাকমা রীতি অনুযায়ী। তিনি সামাজিক বিচার-আচার পরিচালনা করেন। উল্লেখ্য যে, চাকমা রাজা একজন

'হেডম্যান' ও বটে। চাকমা রাজা চাকমা সমাজ বিষয় ও চাকমা সার্কেল বিষয়ে জেলা প্রশাসকের একজন গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শদাতাও বটে। চাকমা রাজা চাকমা উপজাতি সমাজের প্রতীক। তিনি চাকমা উপজাতি জনগোষ্ঠীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। চাকমা রাজা চাকমা সমাজের ঐক্য ও সংস্কৃতিরও প্রতীক।

চাকমারা জুম চাষ বা পর্যায়ক্রমে চাষের উপর নির্ভরশীল। যদিও সরকার জুম চাষ বা পর্যায়ক্রম বরাবরই নিরুৎসাহিত করে আসছেন তবু এখনও চাকমা সমাজে জুম চাষ ব্যবস্থা চালু আছে।

অন্যান্য উপজাতীয় অপেক্ষা চাকমা উপজাতীয়রা বেশ শিক্ষিত। অনেক শিক্ষিত মহিলা ও পুরুষ বিভিন্ন অফিস আদালতে চাকুরী করছেন।

চাকমাদের মৃতদেহ পোড়ান হয়। তবে দশ বছরের কমবয়স্ক বালক বালিকাদের কবর দেয়া হয়। চাকমা সমাজে বুধবার মৃতদেহ পোড়ানোর বিধান নেই।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপজাতিদের মধ্যে চাকমারাই বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ কারণে তাদের শিল্প সংস্কৃতি বৈচিত্রময়। বাংলাদেশের লোক সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করে তোলার মূলে চাকমা সাংস্কৃতিক অবদান যথেষ্ট।

মগ ঃ

বাংলাদেশের বান্দরবান পার্বত্য জেলায় অধিক সংখ্যক মগ উপজাতীয় সম্প্রদায় বসবাস করে। এছাড়া কক্সবাজার ও পটুয়াখালী জেলার খেপুপাড়া অঞ্চলের কোন কোন এলাকায় মগ উপজাতীয়দের আবাসভূমি রয়েছে। বান্দরবান পার্বত্য জেলা এবং কক্সবাজারে বসবাসরত মগদের আদি বাসস্থান ছিল আরাকানে। দশম শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে শুরু করে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত আরাকানরা অনেকবার চট্টগ্রাম দখল করে এখানে

রাজত্ব করে। তখন থেকে কিছু সংখ্যক আরাকানী এখানে বসতি স্থাপন করে বসবাস শুরু করতে থাকে। বান্দরবান পার্বত্য জেলা এবং কক্সবাজারে বসবাসরত মগরা এদেরই বংশধর বলে অনেকে অনুমান করেন। পটুয়াখালী জেলায় বসবাসরত মগদের সম্পর্কে জানা যায় যে, ১৭৮৯ সালে রেঙ্গুন থেকে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে কিছু সংখ্যক লোক এসেছিল সুন্দরবন অঞ্চল আবাদ করতে। পরবর্তী কালে তারা আর দেশে ফিরে না গিয়ে খেপুপাড়ায় বসতি স্থাপন করে। খেপুপাড়ায় বসবাসরত

মগরা ঐ রেঙ্গুনবাসীদের উত্তরসূরী। মগ শব্দটি কোথা থেকে এসেছে তা বলা দুঃসাধ্য। কক্সবাজার অঞ্চলের শিক্ষিত মগরা নিজেদেরকে মগ বলে পরিচয় দিতে অস্বীকার করেন বরং তারা নিজেদেরকে বার্মিজ বা আরাকানী বলে পরিচয় দিতে অধিকতর মর্যাদাশীল বলে মনে করেন। আরাকানী বা বার্মিজদের মধ্যে মগ বলে কোন জাতি নেই। শিক্ষিত মগেরা মনে করে মগ কথাটি বাঙ্গালীদের দেয়া নাম এবং মগ বলতে আরাকানী জলদস্যুদের বোঝায়। মগরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। মগদের ধর্মগ্রন্থের নাম "আদুত্তুয়াং"। মগদের মধ্যে গোত্র বিভাগ আছে। এ পর্যন্ত মগদের মধ্যে ১৫টি গোত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে।

মগ সমাজে সংসারের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সাধারণতঃ মেয়েদের উপরই ন্যস্ত। সংসারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলতে আমরা চাষাবাদ অথবা রুটি রুজির সংস্থানকে বুঝে থাকি। এ বিষয়ে মগ পুরুষরা অনেকটা অপ্রধান হলেও গোত্রগুলি কিন্তু পুরুষ পক্ষকেই কেন্দ্র করে পরিচিত। মগদের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা পরিচালিত। বহির্বিবাহ এবং আন্তঃবিবাহ এই উভয় রীতি মগদের মধ্যে পরিচালিত আছে। কতকগুলি সামাজিক বাধা-নিষেধ সম্পর্কে মগরা খুবই সচেতন। যেমন কোন গোত্রের নামের সঙ্গে যদি ফলমূলের নাম মিলে যায় তাহলে সেই ফল খাওয়া তাদের উপরে নিষিদ্ধ। অথবা কোন গোত্রের সঙ্গে যদি মেয়ে-পুরুষের নাম মিলে যায় তবে সেখানে বিয়ে চলে না। মগরা অপর জাতি থেকে স্ত্রী গ্রহণ করেনা। তাদের সমাজে কোন মেয়ে যদি নিজের ইচ্ছায় ভিন্ন জাতি থেকে স্বামী গ্রহণ করে তাহলে মগদের সামাজিক আইনে তা দূষণীয় বলে বিবেচিত হয় না। মগ সমাজে মেয়ের পছন্দেই বর ঠিক করা হয়ে থাকে। বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করার পর মেয়ে যদি ছেলে পছন্দ করে তাহলে ছেলের পরে বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজন এক বোতল মদ নিয়ে মেয়ের বাড়ীতে যায়। এ সময় বিয়ে সম্পর্কে প্রাথমিক আলাপ আলোচনা হয়। অবশ্য এ বিষয়েও মগদের মধ্যে কতকগুলি সংস্কার রয়ে গেছে। ছেলে পক্ষের যেসব লোক বিয়ের কথাবার্তা বলার জন্য মেয়ের বাড়ীতে যাবে তাদের সংখ্যা বেজোড় পুরুষ হতে হবে। বিপত্নীক অথবা বিধবা বিবাহকারী এই দলের মধ্যে থাকতে পারবে না। প্রাথমিক আলাপ আলোচনার পর উভয়পক্ষের বসবার আরো একটি দিন ধার্য করা হয়। এ আয়োজনও কনের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়। এ আলোচনা সভায় আরো একটি দিন ধার্য করা হয় উভয়পক্ষের আলোচনার জন্য। এই দিন উভয়পক্ষের ইপ্সিত বস্তুর জন্য স্বপ্নের আয়োজন করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, মগ সম্প্রদায় ভবিষ্যৎ কর্মের শুভ অশুভ ফলাফল স্বপ্নের মাধ্যমে নির্ধারণ করে থাকে। নির্দিষ্ট দিনে বর ও কনে নিজ নিজ বাড়ীতে গোসল সেরে চুসুংলে দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা দেয় এবং রাতে স্বপ্ন দেখার জন্য খুব পবিত্রভাবে

শয়ন করে। সম্ভবতঃ স্বপ্ন দেখার বিষয়বস্তুর অর্থ অনুসারে তাদের বিয়ের বিষয়টি নির্ধারিত হয় বর বা কনে অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে তাদের পিতামাতা বা অভিভাবক এই স্বপ্ন দেখার অধিকার পায়। পরের দিন সকালে স্বপ্নের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বর ও কনে পক্ষের মুরুব্বীগণ যথাক্রমে বর ও কনের বাড়ী যায়। তারা বর ও কনের কাছ থেকে তাদের দেখা স্বপ্ন সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়। স্বপ্নের ফলাফল শুভ হলে বিয়ের দিন ধার্য করা হয়। বিয়ের দুদিন আগে বর ও কনে নিজ নিজ মতানুযায়ী গ্রামের লোকদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়। উপযুক্ত মদ পরিবেশন ও নৃত্যগীত এই অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। বিয়ের দুদিন আগে সন্ধ্যায় একটি শুকর, পাঁচটি মুরগী ও কিছু পান সুপারি মগদের গৃহদেবতা চুসুংলের নামে উৎসর্গ করা হয়। এই ব্রত পালনের পর বর ও কনের জন্য যার যার বাড়ীতে নতুন কাপড় পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই কাপড় সাধারণতঃ কনের জন্য থাকে এনিজ্যি ও বরের জন্য রেশমী লুঙ্গী হয়ে থাকে। বরের জন্য একটি গেস্তংবোং ও বা পাগড়ী পাঠান হয়। নতুন কাপড় পাঠানোর পরে বর ও কনেকে ঘিরে নাচ গানের ধুম পড়ে যায়। পাত্রী তুলে আনার আগে কন্যাপক্ষের গ্রামের সকল ছেলেরা বাড়ীর বাইরে বাঁশ ও কাগজ দিয়ে একটি প্যাগোডা তৈরি করে। ঐ কাজ করার জন্য তারা উপযুক্ত পারিশ্রমিক এবং খাবার পায়। বিয়ে বাড়ীতে এসে বর ও তার বন্ধুরা এই প্যাগোডায় বসে। রাতে বরকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে বাড়ির মন্ত্রপড়ে বিয়ে কার্য সমাধান হয়। পরের দিন সকালে বর ঐ প্যাগোডায় ফিরে এসে তাদের সুখময় জীবনের জন্য বুদ্ধকে স্মরণ করে তার কাছে প্রার্থনা করে। প্রার্থনা শেষ হলে বর তার কিছু সংখ্যক বন্ধু নিয়ে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে। এ সময় বরকে নানা প্রকার বাধা দেওয়া হয়। এই বাধাকে অতিক্রম করে বরকে অন্দরমহলে প্রবেশ করতে হয়। বর অন্দরমহলে প্রবেশ করলে তাকে ঘরের মেঝেতে পেতে রাখা মাদুরে বসতে দেয়া হয়। অতঃপর বর ও কনেকে ডান ও বাম পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। তাদের পাশে রাখা হয় চাল ও পানি ভর্তি কলসী। ঐ কলসীর মধ্যে থাকে আমপাতা বা আঙ্গুরপাতা। একজন মুরুব্বী কলসী থেকে পাতা তুলে বর ও কনের শরীরে পাঁচ বা সাতবার পানির ছিটা দেয়। তখন বন্ধুদের মধ্যে থেকে একজন উঠে এসে বরের বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল এবং কনের ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলকে একত্রে আটকিয়ে দেয়। এভাবে কিছুক্ষন থাকার পর বর ও কনেকে ফুল সজ্জিত আসনে বসিয়ে মুরুব্বীরা আবারও কলসীর মধ্যে রাখা পাতার সাহায্যে বর ও কনের গায়ে পানি ছিটাতে থাকে। এরপর বর ও কনেকে একই পাত্রে খেতে দেয়া হয়। এই ভাত ভর্তি থালাকে মঙ্গলা থালা বলা হয়। বর এই থালা থেকে কিছু ভাত নিয়ে প্রথমে স্ত্রী মাথায় এবং পরে নিজের মাথার উপর ছিটিয়ে দেয়। এরপর আত্মীয়-স্বজনরা ও

মুরুব্বীরা তাদের আশীর্বাদ করে এবং উপহার সামগ্রী প্রদান করে। বরকে সাত আট দিন শ্বশুর বাড়ীতে থাকতে হয়। অতঃপর বর কনেকে নিয়ে নিজের বাড়ী চলে যায়।

মগরা সাধারণতঃ জুম চাষাবাদের উপর নির্ভরশীল। মগ পুরুষদের চেয়ে মগ নারীরা বেশি পরিশ্রমী। সাংসারিক সব কাজেই মগ নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। মগেরা জুম চাষ করা ছাড়া তাঁতে কাপড় বোনা ও চুরুট তৈরিতে সিদ্ধহস্ত। মগ মেয়ে পুরুষ উভয়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসে। যৌবন প্রাপ্তির পর অবাধ মেলামেশার রীতি মগদের মধ্যে বিরাজমান। অন্যান্য পাহাড়ী জাতির তুলনায় মগদের নৈতিকতা অনেকটা শিথিল। তবে বিয়ের পর কোন মগ নারীকে পথভ্রষ্টা হতে দেখা যায় না। এটি মগদের ধর্মীয় রীতি এবং এই কারণে তারা বিয়ের পর খুবই বিশ্বস্ত জীবন যাপন করে।

মৃত্যুর পর মগদের পোড়ানো হয়। মৃতদেহ পোড়ানোর আগে মৃতদেহকে গোসল করিয়ে নতুন কাপড় দিয়ে পরিবৃত করা হয়। এই কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করে নারী পুরুষ ভেদে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। শবাচ্ছাদন করার পর তা বাড়ীর উঠানে স্থানান্তরিত করে, এ সময় বন্দুক ছোড়া হয় ও ঢাক-ঢোল পেটানো হয়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন লোকের মৃত্যু হয়েছে। মগদের মৃতদেহের মাথা উত্তরদিকে রেখে পোড়ানো হয়। কোন কোন গোত্র আবার এই ছাই ও হাড় নদীতে ফেলে। ধনীলোক বা রাজাদের মৃতদেহ কয়েক পূর্ণিমা পর্যন্ত রেখে তারপর পোড়ানো হয়।

০৫. বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনঃ

বাংলাদেশ ইতিহাস সমৃদ্ধ দেশ। যুগে যুগে বহু জাতি, ধর্ম, গোত্রের লোক এ দেশে এসেছে। তাদের নির্মিত বহু স্থাপনা ও এদের ধ্বংসাবশেষ আজও কালের সাক্ষী হয়ে টিকে রয়েছে। ঐতিহাসিক স্থাপনা একটি জাতির আদি ও প্রাচীন ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সমূহকে বুঝায়। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল– বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ, বগুড়ার মহাস্থানগড়, কুমিল্লার ময়নামতি, নওগাঁর পাহাড়পুর, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও ইত্যাদি।

ষাট গম্বুজ মসজিদ ঃ

বাংলাদেশের মুসলিম স্থাপত্যকীর্তির সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিদর্শন হচ্ছে হযরত খান জাহান আলী (রাঃ) কর্তৃক নির্মিত বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ।

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় ইমারত বাগেরহাটের তথাকথিত ষাট গম্বুজ মসজিদটির নামকরণ সঠিক নয় কারণ ভূমি নকশা অনুযায়ী এ ইমারতের মধ্যভাগ ৭টি

চেন্তচালা ছাদ এবং এর উভয় পাশে ৩৫টি করে মোট ৭০টি অর্থাৎ সর্বমোট ৭৭টি চালা গম্বুজ রয়েছে। ষাট গম্বুজ মসজিদটি ১৮৬৬ সালে আর সি. স্ট্রার্নডেল পর্যবেক্ষণ করেন। সম্ভবত তিনিই সর্বপ্রথম এ ইমারতের স্থাপত্যকৌশল বর্ণনা করেন। তার ভাষায় চার মাইল

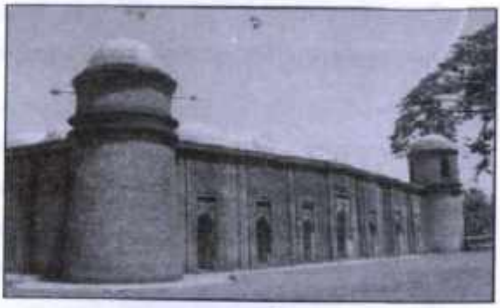

যাওয়ার পর হঠাৎ সড়কটি উঁচু হয়ে প্রায় ৫০ ফুট টিবির দিকে চলে গেছে। এটি একটি কৃত্রিম দিঘির (ঘোড়া দিঘি) পাড়, যেখানে ঘন বন জঙ্গল দেখা যাবে এবং ছিদ্র বিশিষ্ট এক ইটের প্রাচীরে একটি খিলান প্রবেশ পথের দিকে চলে গেছে। এ ফটকের মধ্য দিয়ে একটি মসজিদের চত্বরে পৌছানো যায়। বাগেরহাটের এ অত্যুৎকৃষ্ট ইমারতটি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

ষাট গম্বুজ মসজিদটির দৈর্ঘ্য ১৬০ ফুট এবং প্রস্ত ১০৮ ফুট। গৃহের অভ্যন্তরে গম্বুজের উচ্চতা ২২ ফুট। এ বিশালাকার হর্মের সম্মুখ দিকে মধ্যস্থলে একটি বড় খিলান ও এর দুই পাশে পাঁচটি করে ছোট খিলান আছে (মোট ১১টি)। এর প্রাচীরের প্রশস্ততা ৯ ফুট। ষাট গম্বুজ মসজিদ ও খান জাহান আলীর সমাধী সৌধ বিশেষ স্থাপত্য বৈচিত্র্যের ভাস্বর।

মহাস্থানগড় ঃ

বর্তমান বগুড়া থেকে প্রায় ৮ মাইল উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে মহাস্থানগড় অবস্থিত। এটি বৌদ্ধ ও হিন্দু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। এটি একটি পাকা রাস্তার মাধ্যমে বগুড়া শহরের সাথে সংযুক্ত। মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষ ৫০০০ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ৪৫০০ ফুট প্রস্ত বিশিষ্ট। চারপাশের সমতলভূমি থেকে এর উচ্চতা প্রায় ১৫ ফুট। মহাস্থান দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরের কিছু অংশ পরিখা দ্বারা এবং পূর্ব ও উত্তর দিকের অধিকাংশ স্থান

করতোয়া নদী দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। এই প্রাচীন নগরীর বাইরে চারপাশে প্রায় ৫ মাইল এলাকায় এখনও বহু প্রাচীন প্রত্নাবশেষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশে মহাস্থানগড়ের মত আর কোন ঐতিহাসিক প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়নি। খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় ১৫ শতাব্দী পর্যন্ত এই নগরী প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর ছিল। এখানে মৌর্য, গুপ্ত, পাল ছাড়াও আরো কতিপয় হিন্দু সামন্ত রাজবংশের রাজধানী ছিল। এখানেই ছিল বিখ্যাত পুন্ড্রোনগর।

ময়নামতি ঃ

লালমাই আর ময়নামতি হচ্ছে পাহাড়ের নাম। কুমিলা শহর থেকে ৫ মাইল পশ্চিমে এই পাহাড় অবস্থিত। পাহাড়টি উত্তর-দক্ষিণে লম্বায় ১১ মাইল। পাহাড়ের উপরের অংশ সমতল। এর উচ্চতা ৫০ ফুট। ১০০ ফুট উঁচু ছোট বড় কয়েকটি টিলাও আছে। এই পাহাড়ের উত্তর অংশের নাম ময়নামতি আর দক্ষিণ অংশের নাম লালমাই। আয়তনের দিক থেকে লালমাই পাহাড় ময়নামতি থেকে বেশ বড়। লালমাটি আর ছোট বড় গাছ-গাছালিতে ছাওয়া এই পাহাড় দেখতে খুবই সুন্দর।

পাহাড় দু'টির বয়স কয়েক লক্ষ বছর বলে পন্ডিতেরা অনুমান করেন। এ দু'টি পাহাড়ে অনেক পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এই এলাকায় বসে অন্তত ৩০ জন রাজা রাজ্য শাসন করতেন। এই পাহাড় এলাকায় পাওয়া গেছে আনন্দ বিহার, কোটিলা মুড়া এবং কোট বাড়ি ও বৈরাগীর ভিটাসহ অসংখ্য প্রাচীন কীর্তি।

পাহাড়ের ঠিক পূর্ব কোণেই রয়েছে শালবন বিহার। বিহারটিতে মোট ১১৫ টি কক্ষ বা ঘর ছিলো। প্রতিটি ঘরের মাপ ছিল ১২ বর্গ ফুট। দেয়াল ছিল ৫ ফুট পুরু। ঘরগুলিতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বাস করতেন।

পাহাড়পুর বিহার ঃ

আমাদের পরম গৌরব ও আনন্দের বিষয় যে, নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরেই রয়েছে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও দীর্ঘতম প্রাচীন কীর্তি সোমপুর বিহার। বর্তমানে এটি পাহাড়পুর বিহার নামেই সবার কাছে পরিচিত। বৌদ্ধ বিহারটি পাল বংশের দ্বিতীয় রাজা ধর্মপাল দেব নির্মাণ করেন। খনন কার্যের মাধ্যমে এ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

পাহাড়পুর বিহারের আয়তন ভারতের বিখ্যাত নালন্দা মহাবিহারের মতোই। সম্ভবত

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই এটিকে দুর্গের মতো করে গড়ে তোলা হয়েছিল। লম্বা বাহুযুক্ত এই বিহারটি পূর্ব-পশ্চিমে ৯২২ ফুট এবং উত্তর-দক্ষিণে ৯১৮ ফুট। বিহারের চতুর্দিকে পুরু মোটা দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল। দেয়ালের ঘনত্ব ছিল ১৬ ফুট। বিহারটিতে

কামরা ছিল মোট ১৭৭ টি। ঘরগুলিতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বাস করতেন। বিশাল এই বিহারটি ভেঙে পড়ায় এটি ঠিক কয় তলা ছিল তা আজ আর সঠিক করে বলা যাচ্ছে না।

নবম খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে বিহারটি নির্মিত হওয়ার পর প্রায় ৩০০ বছর ধরে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পন্ডিত এখানে এসেছেন। কেউ ধর্ম শিক্ষার জন্য, আবার কেউ শিক্ষাদানের জন্য। কেবল উপমহাদেশের বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পন্ডিতগণই নন - ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, চীন, তিব্বতসহ আরো অনেক দেশের শিক্ষার্থী ও পন্ডিতগণ এখানে আসতেন।

০৬। ভাষা শিক্ষা ও যোগাযোগ পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ঃ

ক) ইংরেজিতে কারো সাথে ভাব বিনিময় করা ঃ

ইংরেজিতে কেউ ভাব বিনিময় করতে গেলে সাধারণত আশেপাশের লোকজন দ্বারা কোনঠাসা মূলক বিব্রতকর কথা শুনতে হয়। অনেকে বলেন ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন করছি কি জন্যে? কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, ১৯৫২ সালের আন্দোলন কোন ভাষার বিরুদ্ধে ছিলনা। এমন কি উর্দুর বিপক্ষেও নয়। সে আন্দোলন ছিল বাংলা ভাষায় নিজে কথা বলতে পারা তথা দাপ্তরিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের আইনি স্বীকৃতি লাভ। বিশ্বায়নের এ যুগে আমরা যদি সার্বজনীন কোন ভাষা ব্যবহারের চিন্তা করি তবে প্রথমেই আসবে 'ইংরেজির' কথা। কারণ, যাঁরা অন্যান্য দেশের মানুষের সাথে যোগাযোগ করেণ তারা মাধ্যম হিসেবে ইংরেজিকেই বেছে নেন। তাছাড়া বর্তমান সময়ে বিভিন্ন অফিসে ইংরেজিতে কথা বলতে পারা চাকুরী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। তাই যুগের সাথে তাল মিলাতে তথা অপেক্ষাকৃত বেশী যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়ার জন্য প্রমিত বাংলা শেখার পরই ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলতে পারার বিশেষ কায়দা একজনকে রপ্ত করা আবশ্যক। যেহেতু ইংরেজি আমাদের মাতৃভাষা নয়। আবার শেখার তেমন অনুকূল পরিবেশ নেই। তাই কয়েকজন বন্ধু মিলে গ্রুপ

ওয়ার্ক অথবা নিজে নিজে আয়নার সামনে দাড়িয়ে ইংরেজিতে কথা বলার অভ্যাস করতে হবে। কারণ যথার্থ অনুশীলন একজনকে চৌকষ করে তোলে। নিম্নে দুইজন অপরিচিতের মধ্যেকার নমুনা কথোপকথন তুলে ধরা হলো।

Sumiya : Hello. Good morning.

Pavel : Very good morning. Do you want to say something to me?

Sumiya : Yes. I'd like to talk with you for few minutes if you permit me.

Pavel : Sure. Waht is your name?

Sumiya : I'm Sumiya Tajrin. What's your name?

Pavel : I'm Pavel Islam and doing my MSS from DU. What about you?

Sumiya : I've passed my HSC examination with GPA 5.00 and getting preparation for university admission.

Pavel : That's good. Where do you live?

Sumiya : I live in Dhanmondi, Dhaka. You are from where?

Pavel : Currently I live in Science Lab. But, I'm from Naogaon.

Sumiya : That's really good. And pleasure to talk with you.

Pavel : You are pretty one to talk. Nice to meet you here.

Sumiya : Thank you so much.

Pavel : You are welcome.

খ) ইংরেজিতে একটি চিঠি লিখতে পারাঃ

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের মনের ভাব তার নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট পৌছানোর জন্য চিঠি ব্যবহার করে আসছে। কালের বিবর্তনে কবুতর, ঘোড়া, ডাক পিওন এবং বর্তমান সময়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে একজন অন্যজনের কাছে চিঠি পাঠাচ্ছে। পত্র লেখার কিছু প্রথাগত পদ্ধতি রয়েছে। একটি উত্তম পত্র লিখতে এসকল নিয়ম মেনে লিখতে হয়। চিঠি লেখার সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির প্রতি নজর দিতে হবে।

১. দেখতে হবে পত্রের বিভিন্ন অংশ যেমন- Salutation, Complimentary Closing and signature

২. পত্র লেখার উদ্দেশ্যটা মাথায় থাকতে হবে এবং তা প্রথম Para-তেই স্পষ্ট হতে হবে।

৩. প্রাপকের বৈশিষ্ট্য ও মানসিকতা অনুযায়ী পত্র রচিত হওয়া উচিত। এজন্য সঠিক ভাষা ও ভঙ্গি ব্যবহার করতে হবে।

৪. প্রাপক যা জানতে চায় লেখার সময় তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় কথা লেখা বাঞ্ছনীয় নয়।

৫. প্রাপককে কিছু বলার থাকলে Closing- এ তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়।

৬. বাক্যের দৈর্ঘ্য ও গঠন মাঝারি হলে ভাল। একটি মাঝারি বাক্যে ১০ থেকে ২০টি শব্দ থাকতে পারে।

৭. পত্রের Para- গুলো যাতে বেশি বড় না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। একটি Para- তে পাঁচ থেকে দশটি বাক্য থাকতে পারে। একটি Para- তে একটি ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়

৮. বিরাম চিহ্ন, Capital letter, indenting এগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে।

নিম্নে কয়েক ধরনের চিঠির নাম উল্লেখ করা হলোঃ

Job Application
Business Letter
Personal/ Private Letters
Letters to Newspapaers
Official Letters
Demi Official Letters

গ) তথ্য যোগাযোগ পদ্ধতি সম্পর্কে জানা (ডাক বিভাগ, ই-মেইল, টেলিফোন প্রভৃতি)।

ডাক বিভাগ ঃ ডাক বিভিাগ সরকার নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত একটি বিভাগ । এ বিভাগ সাধারন মানুষের অফিস আদালতের চিঠি পত্রাদি লেনদেন করে থাকে। এছাড়াও জরুরী তথ্যাদি আদান প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে - এ বিভাগে। বর্তমানে মোবাইল ফোন কুরিয়ার সার্ভিস, ইন্টারনেট প্রচলনের ফলে ডাক বিভাগের গুরুত্ব অনেকাংশে হ্যাস পেয়েছে। তবে ইদানিং ডাকা বিভাগ সারা দেশে অর্থ স্থানান্তরের সেবা দিচ্ছে।

ই-মেইল ঃ আধুনিক যোগাযোগের অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে ই-মেইল। সারা বিশ্বে এর ব্যবহার যথেষ্ঠ তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণত ব্যাক্তিগত ও অফিশিয়াল তথ্যাদি আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ই-মেইলের ব্যপকতা প্রচুর । ই-মেইল ব্যবহারের জন্য কোন চার্জ বা ফি দিতে হয় না। তথ্য আদান প্রধানের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা ও বজায় রাখা সম্ভব। প্রত্যেক রোভারেরই একটি ই-মেইল অ্যাকাউন্ট থাকা উচিত, যাতে তারা সকলের সাথে তথ্য আদান প্রদান করতে পারে।

টেলিফোন ঃ তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে টেলিফোন ব্যাপক প্রচলিত একটি মাধ্যম। কিছু দিন আগেও তার সংযোগ ল্যান্ড ফোনের প্রচলন ছিল সারা বিশ্ব ব্যাপি। কিন্তু বর্তমানে মোবাইল ফোনের ব্যাপক প্রচলনের কারনে ল্যান্ড ফোনের গুরুত ও ব্যবহার হ্যাস পাচ্ছে। সিম কার্ড যুক্ত মোবাইল ফোন ব্যবহারের পাশাপাশি আমরা যদি বিভিন্ন অ্যাপস ব্যবহার করি তাহলে বিনা খরচে কথা বলা যাবে এবং তথ্যাদির আদান প্রদান কারা সম্ভব হবে।

ব্যবহারিক কাজ

০৭। রেকর্ড সংরক্ষণ

(ক) মাই প্রোগ্রেস সংরক্ষণ করা ঃ

একজন রোভার স্কাউট তাঁর রোভার মেট, সিনিয়র রোভার মেট এবং রোভার লিডারের সহায়তায় মাই প্রোগ্রেস বই সংরক্ষণ করবে। অর্থাৎ নিয়মিতভাবে ক্রু-মিটিং থেকে রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম অনুযায়ী শেখা বিষয়গুলোর উপর রোভার স্কাউট লিডার মূল্যায়ন করবেন এবং মান উত্তীর্ণের তারিখ প্রদান করে স্বাক্ষর করবেন। সময়মত একজন স্কাউটকেই এ কাজ করতে হবে।

(খ) লগ বই লেখা অব্যাহত রাখা ঃ

এই পর্যায়ে একজন রোভার স্কাউট উল্লিখিত নিয়মানুযায়ী তাঁর লগ বই লেখা অব্যাহত রাখবে। রোভার মেট, সিনিয়র রোভার মেট এবং রোভার স্কাউট লিডারের সহায়তায় লগ বই এমন ভাবে প্রণয়ন করতে হবে, যাতে একজন রোভারের স্বকীয়তা প্রকাশ পায়। লগ বইয়ের সানোন্নয়নে প্রয়োজন বোধে প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অথবা কোন লিডার ট্রেনার বা সহকারী লিডার ট্রেনারের পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে যে, রোভার প্রোগ্রাম অনুযায়ী কোন রোভার লগ বই সম্পন্ন না করে স্তর অতিক্রম করতে পারবে না ।

০৮। ব্যবহারিক দক্ষতা ঃ

পাইওনিয়ারিং ও দড়ির কাজ ঃ

(১) নিম্নলিখিত গেরোসমূহ সঠিকভাবে বাঁধতে পারা ও তাদের ব্যবহার জানা ঃ ড্র হিচ, ফায়ার‍্যানস চেয়ার নট, মারলাইন স্পাইক হিচ, ফিসারম্যানস বেন্ড, স্ক্যাফোল্ড হিচ, ম্যান হারনেস হিচ, ক্যাটস প, বোলাইন অন দি বাইট, রোলিং হিচ। নিচে গেরো সমূহের বিবরণ দেয়া হলো।

ড্র হিচ (DRAW HITCH) ঃ

শক্ত একগাছি দড়িকে প্রথমে সমান দু'ভাগে ভাঁজ করে নিতে হবে। এভাবে ভাগ করার পর দড়ির প্রান্ত যে দিকে আছে তার বিপরীত দিককে কোন গাছের ডালের উপর ছুঁড়ে ঐ প্রান্তকে নিজের দিকে এসে দড়ির ঐ অংশকে বাম হাতে ধরতে হবে। ডান হাতে ধরা থাকবে দড়ির দুই প্রান্ত সম্বলিত অপর অংশ। বাম হাতে দড়ির যে অংশ আছে তাতে একটি বাইট থাকবে। ডান হাতে দড়ির যে অংশ আছে ঐ অংশকে ঐ বাইটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ঐ অংশকে বাম হাতে ধরলে (এই সময়

বাইটের অংশকে ছেড়ে দিতে হবে) এর ফলে এখানে আবার একটি নতুন বাইট তৈরি হবে। এবার ডান হাতের ডান দিকে দড়ির যে অংশ আছে ঐ অংশকে ঐ নতুন বাইটের মধ্যে ঢুকিয়ে আগের বাইট ছেড়ে দিয়ে ঐ অংশকে বাম হাত দিয়ে ধরতে হবে। এরপর পর্যায়ক্রমে বাম হাতে ধরা দড়িকে প্রথমে টেনে পরে ডান হাতে ধরা দড়িকে টানতে হবে। এভাবে টানতে টানতে দড়িতে দেয়া প্যাঁচগুলি গাছের ডালে শক্তভাবে বসে যাবে। এভাবে ড্র হিচ বাঁধতে হয়। দেয়া ছবির অনুকরণে অনুশীলন করলে এই গেরো সহজে বাঁধা যেতে পারে।

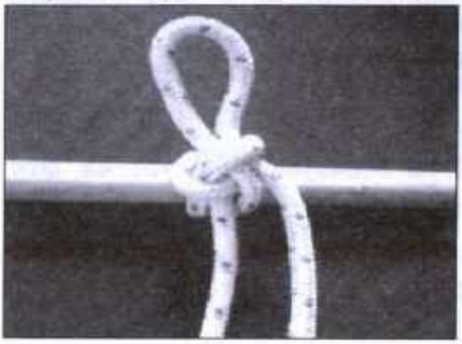

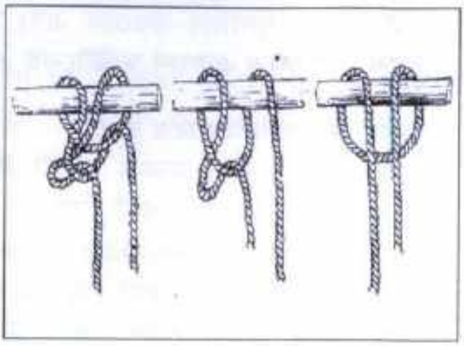

ব্যবহার ঃ চলার পথে অল্প চওড়া নালা বা ডোবা পার হবার জন্য ঐ নালা বা ডোবার পাশে যদি কোন গাছ থাকে এবং ঐ গাছের কোন শক্ত ডাল যদি ঐ নালা বা ডোবার উপরে থাকে তাহলে ঐ গাছের ডালে ড্র হিচ বেঁধে ড্র হিচ বাঁধা দড়ি ধরে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ঝুলে যাওয়া যায়।

ড্র হিচ খোলার জন্য দড়ির প্রান্ত সম্বলিত দড়ির যে দু'টি অংশ আছে তার একটি ধরে টানলে দড়ি খুলে যাবে।

ফায়ারম্যানস্ চেয়ার নট (FIREMAN'S CHAIR KNOT) ঃ

বাম হাতের তালুর উপর একটি বড় দড়ির মাঝামাঝি অংশ রাখতে হবে। এবার ডান হাত দিয়ে তালুর উপর ঐ দড়ি দিয়ে এন্টি ক্লক ওয়াইজ পর পর দু'টি লুপ তৈরি করতে হবে। মনে করি প্রথম তৈরি লুপটি 'ক' এবং দ্বিতীয় বারে তৈরি লুপটি 'খ'। এবার 'খ' লুপকে 'ক' লুপের মাঝামাঝি অংশে রাখতে হবে।

এবার 'খ' লুপের যে অংশ 'ক' লুপের মাঝামাঝি আছে তাকে 'খ' লুপের উপর দিকে এবং 'ক' লুপের যে অংশ 'খ' লুপের মাঝখানে আছে তাকে 'খ' লুপের নিচ দিয়ে টেনে বাইরে বের করে আনতে হবে। নিজের খুশীমত এভাবে তৈরি লুপ দু'টিকে বড় করে নিতে পারা যাবে। লুপের যে প্রান্ত অপর লুপের মধ্যে দিয়ে এসেছে সে দু'টিকে দু প্রান্তে আস্তে আস্তে টানলে গেরো শক্ত হয়ে যাবে। এভাবে

তৈরি লুপ দু'টির দুপাশের দড়ির চলমান অংশ দিয়ে পৃথক পৃথক দু'টি লুপ তৈরি করে ঐ দু'টি লুপকে আগের তৈরি লুপের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে লুপ দু'টিকে আগের তৈরি প্যাঁচ দু'টির গায়ের সাথে লাগিয়ে দিতে হবে। এভাবে 'ফায়ারম্যানস্ চেয়ার নট' তৈরি করতে হয়। দেয়া ছবি অনুকরণে অনুশীলন করলে সহজে 'ফায়ারম্যানস্ চেয়ার নট' বাঁধা যাবে।

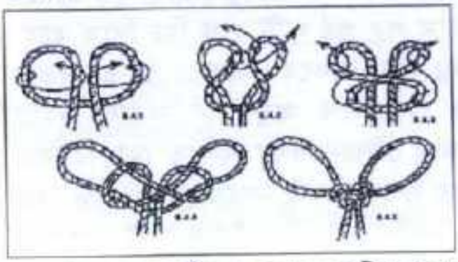

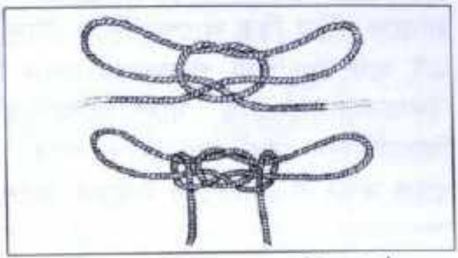

ব্যবহারঃ কোন জীবন্ত লোককে নিচে থেকে উপরে অথবা উপর থেকে নিচে উঠাবার বা নামাবার কাজে 'ফায়ারম্যানস্ চেয়ার নট' ব্যবহার করা হয়।

মারলাইন স্পাইক হিচ (MARLINE SPIKE HITCH) ঃ

মারলাইন স্পাইক হিচ বাঁধার জন্য দড়ির এক প্রান্তে একটি লুপ তৈরি করতে হবে। লুপ তৈরি শেষে দড়ির চলমান অংশকে লুপের মাঝখানে রাখতে হবে। দড়ির চলমান অংশ লুপের নিচে থাকবে।

এবার একটি দন্ড বা বাঁশের এক প্রান্তকে দড়ির চলমান অংশের নিচে দিয়ে ঢুকিয়ে লুপের উপর রাখতে হবে। দড়ির দুই প্রান্তকে টেনে হিচকে শক্ত করে দিতে হবে। এভাবে 'মারলাইন স্পাইক হিচ' বাঁধতে হয়। দেয়া ছবি অনুকরণে অনুশীলন করলে সহজে 'মারলাইন স্পাইক হিচ' বাঁধা যেতে পারে।

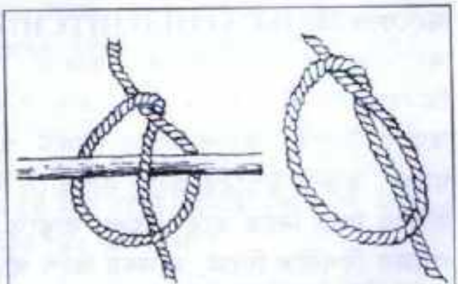

ব্যবহারঃ বাঁশের সাহায্যে সিঁড়ি তৈরি করার জন্য 'মারলাইন স্পাইক হিচ' ব্যবহার করা হয়।

ফিসারম্যানস্ বেন্ড (FISHERMAN'S BEND) ঃ

ফিসারম্যানস্ বেন্ড বাঁধার জন্য কোন খুঁটিতে/রিং এ দড়ির চলমান প্রান্ত দিয়ে দু'বার পূর্ণ প্যাঁচ দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে এই প্যাঁচ দেয়ার সময় যেন দড়ি খুঁটি বা রিংয়ের সাথে লেগে না যায়। প্যাঁচ দেয়ার পর খুঁটি বা রিংয়ের মাঝখানে যেন বেশ ফাঁক থাকে। এবার দড়ির চলমান অংশ ঐ ফাঁকের মধ্যে ঢুকিয়ে দড়ির চলমান প্রান্তকে দড়ির স্থির অংশের দিকে টেনে এনে পর পর দু'টি হাফ হিচ দিতে হবে। এই হাফ হিচ দু'টি পরস্পরের থেকে কিছু দূরে থাকবে। এভাবে তৈরি বেন্ডকে 'ফিসারম্যানস্ বেন্ড' বলে। দেয়া ছবি অনুকরণে অনুশীলন করলে সহজে ফিসারম্যানস্ বেন্ড বাঁধা যেতে পারে। কোন নৌযান যখন নদীতে নোংগর করে থাকে তখন ঐ নোংগরের উপরের অংশে যে রিং থাকে ঐ রিংয়ের সাথে দড়ি দিয়ে ফিসারম্যানস্ বেন্ড বাঁধা হয়। এই বেন্ডের সুবিধা এই যে, নৌযান যতই ঘুরুক না কেন দড়ি নোংগরের রিংয়ের সাথে আলগাভাবে বাঁধা থাকে।

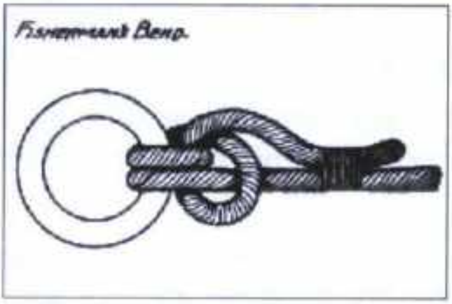

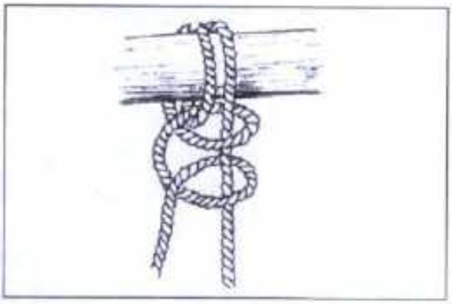

ব্যবহারঃ কোন খুঁটি বা রিংয়ের সাথে কোন দড়িকে আলগাভাবে বাঁধার জন্য 'ফিসারম্যানস্ বেন্ড' ব্যবহার করা হয়।

স্ক্যাফোল্ড হিচ (SCAFOLD HITCH) ঃ

স্ক্যাফোল্ড হিচ দিতে হয় কোন তক্তায়। তক্তার এক প্রান্তে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে তিনবার পূর্ণ প্যাঁচ দিতে হবে। এভাবে তক্তার উপর তিনবার পূর্ণ প্যাঁচ দেয়া হলে তক্তার উপরের অংশে দড়ির তিনটি অংশ এবং তক্তার নিচে দড়ির দু'টি অংশ থাকে। তক্তার উপরের অংশে দড়ির যে তিনটি অংশ আছে তাকে ১,২,৩ নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করে নিতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে দড়ির ১ নম্বর অংশ থাকবে তক্তার প্রান্তের বিপরীত দিকে, ২ নম্বর অংশ থাকবে মাঝখানে এবং ৩ নম্বর অংশ থাকবে প্রান্তের দিকে। তক্তার উপরের অংশে রাখা দড়ির ১ নম্বর অংশকে ২ নম্বর অংশের উপর দিয়ে দড়ির ২ ও ৩ নম্বর অংশের মাঝখানে রাখতে হবে। এবার দড়ির ২ নম্বর অংশকে ১ ও ৩ নম্বর অংশের উপর দিয়ে টেনে তক্তার নিচের দিকে নামিয়ে

দিতে হবে। এবার দড়ির দুপ্রান্তকে টানলে হিচ শক্ত হয়ে যাবে। পরবর্তীতে দড়ির স্থির প্রান্তকে দিয়ে দড়ির চলমান প্রান্তে জীবন রক্ষা গেরো বেঁধে দিতে হবে। দেয়া ছবি অনুকরণে অনুশীলন করলে সহজে 'স্কাফোল্ড হিচ' বাঁধা যেতে পারে।

এভাবে বাঁধার পর তক্তার বিপরীত দিকের প্রান্তে আবার পূর্বের বর্ণনা মতে একটি 'স্কাফোল্ড হিচ' বাঁধতে হবে। এভাবে বাঁধলে তক্তাটি একটি দোলনার মত দেখাবে।

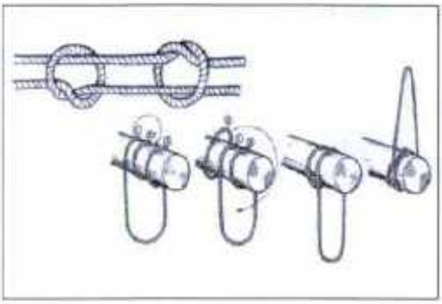

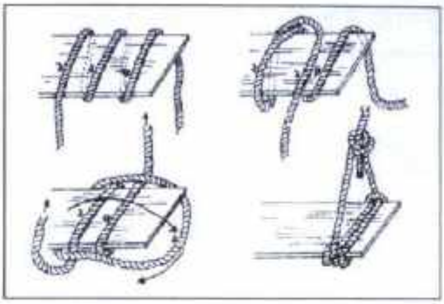

ব্যবহারঃ এরিয়াল রানওয়ে তৈরি করে তাতে লোকজন পারাপার করার জন্য যে বুজমস চেয়ার ব্যবহার করা হয় ঐ বুজমস চেয়ার বাঁধার জন্য 'স্কাফোল্ড হিচ' ব্যবহার করা হয়। শিশুদের খেলার জন্য দোলনায় এই হিচ ব্যবহার করা হয়।

গুন টানা গেরো (MANHERNESS HITCH) ঃ

'ম্যানহারনেস হিচ' বাঁধার জন্য একটি দড়ির এক প্রান্ত ডান হাতে ধরে দড়িকে মাটিতে ছেড়ে দিতে হবে। দড়ির যে অংশ ডান হাত দিয়ে ধরা আছে সেটি হচ্ছে দড়ির চলমান অংশ এবং শরীরের সামনে দড়ির যে অংশ আছে সেটি হচ্ছে দড়ির স্থির অংশ। এবার বাম হাতের যে কোন একটি আঙ্গুলকে শরীরের সামনে রাখা দড়ির স্থির অংশের যে কোন জায়গার সামনের দিকে থেকে রাখতে হবে। এবার দড়ির চলমান প্রান্তকে দড়ির স্থির অংশে যেখানে আঙ্গুল রাখা হয়েছে তার উপর আড়াআড়িভাবে শরীরের সামনের দিকে রাখতে হবে। এভাবে রাখার ফলে সেখানে একটি লুপ তৈরি হবে। এই লুপকে সামনের দিক থেকে নামিয়ে দড়ির স্থির অংশের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় রাখতে হবে। এভাবে রাখার ফলে দেখা যাবে যে সেখান দু'টি লুপ তৈরি হয়েছে। মনে করি বাম দিকে যে লুপ তৈরি হয়েছে সেটি 'ক' ডান দিকে যে লুপ তৈরি হয়েছে সেটি 'খ' এবং দড়ির স্থির অংশ 'গ'।

এবার বাম হাতকে শরীরের সামনের দিকে থেকে 'ক' লুপের মধ্যে ঢুকিয়ে 'গ' এর নিকট দিয়ে 'খ' লুপের দড়িকে ধরে টেনে বাইরে বের করে আনতে হবে। দড়িকে শক্ত করে টান দিয়ে হিচকে শক্ত করে নিতে হবে। হিচ শক্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন

অবস্থাতেই ডান হাতে ধরা দড়ি ছেড়ে দেয়া যাবে না। এভাবে 'ম্যানহারনেস হিচ' বা গুন টানা গেরো বাঁধতে হয়। দেয়া ছবি অনুকরণে অনুশীলন করলে সহজে 'ম্যানহারনেস হিচ' বা গুন টানা গেরো বাঁধা যেতে পারে। 'ম্যানহারনেস হিচ' বা গুন টানা গেরো তৈরির পর দড়ির ঐ প্রান্তে তৈরি লুপের মধ্যে কোন বাঁশ বা লাঠি ঢুকিয়ে এক সাথে একাধিক লোক কোন ভারী কাঠের গুঁড়ি বা ঐ জাতীয় কোন ভারী বোঝা টেনে নিয়ে যেতে পারে। নৌকায় যারা গুন টানে তারা ঐ লুপের মধ্যে এক টুকরো বাঁশ বা দন্ড ঢুকিয়ে ঐ বাঁশ বা দন্ড ধরে টানে।

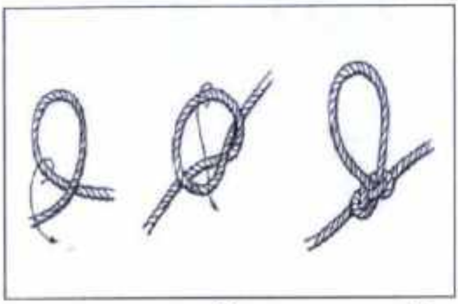

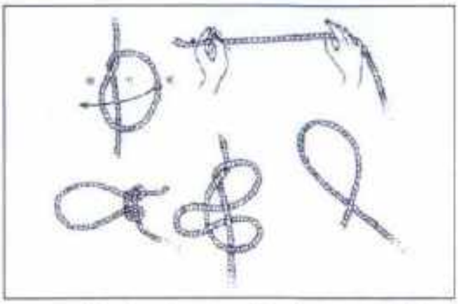

ব্যবহারঃ কোন ভারী বোঝা বা গুন টানার কাজে 'ম্যানহারনেস হিচ' বা গুন টানা গেরো ব্যবহার করা হয়।

ক্যাটস প (CAT'S PAW) ঃ

ক্যাটস প তৈরি করার জন্য প্রথমে দড়িতে একটি বাইট তৈরি করে নিতে হবে। এবার ঐ বাইটকে উল্টিয়ে দড়ির স্থির অংশের উপর রাখতে হবে। এভাবে রাখলে দু'টি লুপ তৈরি হবে। এবার ঐ দু'টি লুপকে পৃথক পৃথকভাবে দুহাতে ধরে কয়েকটি প্যাঁচ দিতে হবে। এভাবে প্যাঁচ দেয়া হলে তা 'ক্যাটস প' হয়ে যাবে। ক্যাটস প তৈরি হয়ে গেলে লুপ দু'টিকে একত্র করে ঐ লুপের মধ্যে কপিকলের হুক বা অন্য কোন দন্ড ঢুকিয়ে দিতে হবে। দেয়া চিত্র অনুকরণে অনুশীলন করলে সহজে 'ক্যাটস প' তৈরি করা যেতে পারে।

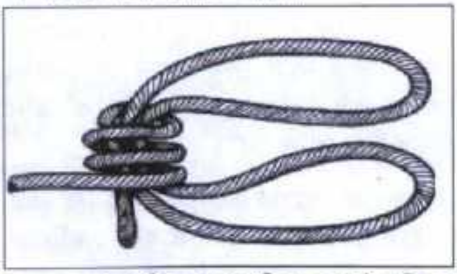

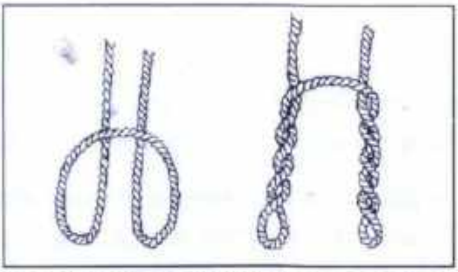

ব্যবহারঃ দড়িতে সাময়িক লুপ তৈরি করতে অথবা দড়ির মধ্যে দন্ড ঢুকাবার জন্য 'ক্যাটস প' ব্যবহার করা হয়।

বোলাইন-অন-দি-বাইট (BOWLINE ON THE BIGHT) :

বোলাইন-অন-দি-বাইট বাঁধার জন্য প্রথমে দড়িকে দু'ভাঁজ করে নিতে হবে। দড়িকে দুভাঁজ করার পর দড়ির প্রান্তদ্বয় যে দিকে আছে তার বিপরীত দিকের অংশ (যে দিকে বাইট আছে) শরীরের দিকে রেখে প্রান্ত সম্বলিত অপর অংশকে শরীরের সামনের দিকে রাখতে হবে। দড়ির যে অংশে লুপ করতে হবে সেই পরিমাণ দড়ি শরীরের দিকে টেনে আনতে হবে। শরীরের দিকে দড়ির যে অংশ আছে সেটি দড়ির চলমান অংশ। এবার দড়ির যে অংশে লুপ তৈরি করতে হবে সেই অংশকে বাম হাতের আঙ্গুলের উপর রেখে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে হাতের আঙ্গুলের উপর একটি লুপ তৈরি করতে হবে। এই লুপ তৈরি করার পর দড়ির চলমান অংশ দড়ির স্থির অংশের উপর থাকবে। এবার দড়ির চলমান অংশের প্রান্তকে (যে দিকে বাইট আছে) ঐ লুপের মধ্যে নিচ দিক দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে হবে। এবার বাইটের উপরের দিক থেকে বাইটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে লুপের মধ্যে দড়ির যে চারটি অংশ আছে তাকে বাইরে টেনে বের করে আনতে হবে। বাইটের মধ্যে দিয়ে দড়ির যে চারটি অংশ বাইরে টেনে আনা হয়েছে তার ডান দিকের অংশে দড়ির যে দু'টি অংশ আছে তাকে ডান হাতে ধরে এবং বাম হাতে দড়ির স্থির অংশ ধরে আস্তে আস্তে টানলে 'বোলাইন-অন-দি-বাইট' তৈরি হয়ে যাবে। দেয়া চিত্রে অনুকরণে অনুশীলন করলে সহজে 'বোলাইন-অন-দি-বাইট' তৈরি করা যেতে পারে।

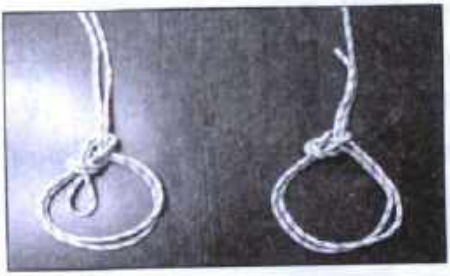

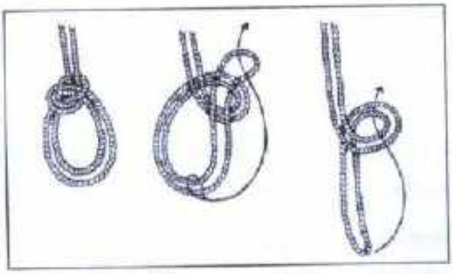

ব্যবহারঃ কোন জীবন্ত লোককে উপর থেকে নিচে অথবা নিচ থেকে উপরে নামাবার বা উঠাবার কাজে 'বোলাইন-অন-দি-বাইট' ব্যবহার করা হয়।

রোলিং হিচ (ROLLING HITCH) :

রোলিং হিচ বাঁধার জন্য কোন একটি খুঁটিতে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে একটি পূর্ণ প্যাঁচ দিতে হবে। এই প্যাঁচ দেয়ার সময় দড়ির স্থির অংশ চলমান অংশের নিচে অথবা উপরে থাকতে পারে। এবার দড়ির চলমান প্রান্ত দিয়ে খুঁটিতে আরো একটি

প্যাঁচ দিয়ে দড়ির প্রান্তকে এইভাবে প্যাঁচ দেওয়ার ফলে তৈরি লুপের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। দড়ির স্থির অংশ এবং দড়ির চলমান প্রান্ত টেনে হিচকে শক্ত করে দিতে হবে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, যে বড়শী গেরো বাঁধার পর দড়ির চলমান প্রান্তকে আবার একবার খুঁটিতে প্যাঁচ দিয়ে নিজের তৈরি লুপের মধ্যে আবার ঢুকিয়ে দিয়ে দড়ির স্থির অংশ এবং দড়ির চলমান প্রান্তকে টান দিয়ে শক্তভাবে খুঁটির সাথে লাগিয়ে দিলে তা 'রোলিং হিচ' হয়ে যাবে। দেয়া ছবি অনুকরণে অনুশীলন করলে সহজে 'রোলিং হিচ' বাঁধা হয়ে যেতে পারে।

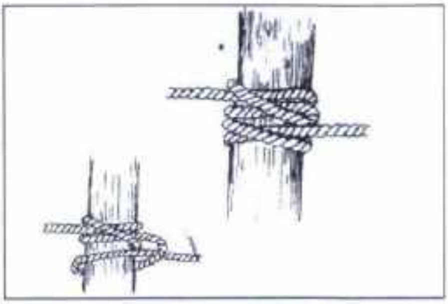

ব্যবহারঃ দড়ির এক প্রান্তকে খুঁটির সাথে বাঁধার জন্য 'রোলিং হিচ' ব্যবহার করা হয়। কোন দড়ির দুর্বল অংশে 'রোলিং হিচ' বেঁধে ঐ দড়িকে কাজের উপযোগী করে তোলা যায়। কোন মোটা দড়ি বা কাছিকে টান টান করার জন্য অপর একটি সরু দড়ি দিয়ে ঐ দড়ি বা কাছিতে 'রোলিং হিচ' বেঁধে ঐ সরু দড়িকে অন্য কিছুর সাথে বেঁধে মোটা দড়ি বা কাছিকে টান করে রাখা যায়।

(২) **ল্যাশিং সমূহ বাঁধতে পারা ও তাদের ব্যবহার জানা ঃ** স্কয়ার ল্যাশিং, ডায়াগোনাল ল্যাশিং, পোল/শেয়ার ল্যাশিং।

ল্যাশিং (LASHING)ঃ

দুই বা একাধিক বাঁশ, লাঠি বা কাঠের দন্ডকে পাশাপাশি, সমান্তরাল, কোণাকোণি বা লম্বালম্বিভাবে শক্ত করে বাঁধার জন্য যে স্কাউটিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাকে ল্যাশিং বলে। স্কাউটদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে, তাঁবু বাসের সময়, গেজেট তৈরি ও পাইওনিয়ারিং এর সময় ল্যাশিং ব্যবহার করতে হয়। তাই স্কাউটদের জন্য বিভিন্ন ধরণের ল্যাশিং সঠিকভাবে দিতে পারা ও ব্যবহার করতে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্কয়ার ল্যাশিং (SQUARE LASHIG)

একটি বাঁশ বা দন্ডকে মাটির উপর খাড়াভাবে রাখতে হবে। এভাবে প্রথম দন্ডটি স্থাপন করে অপর একটি দন্ডকে আগের দন্ডের ওপর আড়াআড়িভাবে রাখতে হবে। যে দন্ডকে মাটির ওপরে খাড়াভাবে রাখা হয়েছে সেটি হচ্ছে 'পোল' এবং পোলের উপরে যে দন্ডকে আড়াআড়িভাবে রাখা হয়েছে সেটি হচ্ছে 'বার'।

এবার পোল এবং বার যেখানে মিলিত হয়েছে তার নিচের অংশের পোলে একটি ক্লোভ হিচ বা বড়শি গেরো বাঁধতে হবে। এবার ঐ দড়ির চলমান অংশকে বারের ওপর দিয়ে পোলকে পিছন দিক থেকে পেঁচিয়ে আবার বারের ওপর রাখতে হবে। এরপর দড়ির চলমান অংশকে বারের নিচে নিতে হবে এবং পোলকে পিছন দিক থেকে পেঁচিয়ে বারের ওপর আনতে হবে। এভাবে অন্ততপক্ষে ৫-৭ বার আগের বর্ণনা অনুযায়ী দড়ির চলমান অংশ দিয়ে পোল এবং বারকে জড়িয়ে প্যাঁচাতে হবে। পোলকে প্যাঁচানোর সময় দড়িকে পোলের নিচে এবং ওপরে প্রথমে যে দু'টি প্যাচ দেওয়া হয়েছিল পরবর্তী প্যাঁচগুলি এই দু'টির মধ্যে রাখতে হবে। যাতে আস্তে আস্তে 'পোলের' এই অংশের ফাঁক বন্ধ হয়ে যায়। বর্ণনা অনুযায়ী 'পোল' এবং 'বার'কে ৫-৭ বার প্যাঁচানো শেষ হলে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে 'পোল' এবং 'বার' এর মাঝে যে দড়ি আছে তাকে শক্ত করে অন্ততপক্ষে ৩-৪ বার প্যাচ দিতে হবে। দড়ির এই অংশকে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে প্যাঁচানোকে ফ্র্যাপিং (FRAPPING) বলে। ফ্র্যাপিং যত শক্ত হবে ল্যাশিং তত মজবুত হবে।

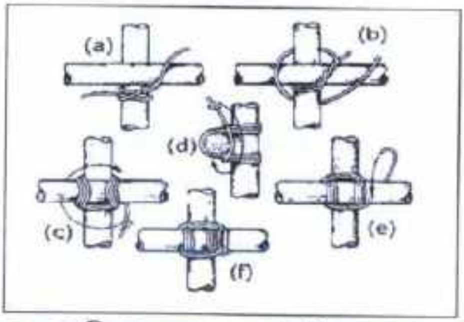

ফ্র্যাপিং দেওয়া শেষ হলে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে বারে ক্লোভ হিচ (CLOVE HITCH) বা বড়শি গেরো বেঁধে ল্যাশিং শেষ করতে হয়। এভাবে স্কয়ার ল্যাশিং (SQUARE LASHING) বাঁধতে হয়।

মাটির ওপর খাড়াভাবে রাখা একটি বাঁশ বা দন্ডকে তার ওপর আড়াআড়িভাবে বা

প্রায় আড়াআড়িভাবে রেখে বাঁধার জন্য স্কয়ার ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়।

ডায়াগোনাল ল্যাশিং (DIAGONAL LASHING)ঃ

একটি বাঁশ বা দন্ডকে অপর একটি বাঁশ বা দন্ডের ওপর কোণাকোণিভাবে (গুণন চিহ্নের মত) অবস্থায় রাখতে হবে। এভাবে রাখার ফলে দু'টি দন্ড যেখানে একত্রিত হবে সেখানে বাঁশ বা দন্ড দু'টিকে একত্র করে একটি টিম্বার হিচ (TIMBER HITCH) বা গুঁড়ি টানা গেরো বাঁধতে হবে। এবার দড়ির চলমান অংশের দিক পরিবর্তন করে অর্থাৎ দড়ির চলমান অংশকে বাইটের দিকে নিয়ে দুই দন্ডকে একত্র করে ৫-৭ বার প্যাঁচ দিতে হবে। এরপর যে দিক থেকে আগে পেঁচানো হয়েছে তার বিপরীত দিক থেকে দুই দন্ডকে একত্রে আগের মত ৫-৭ বার প্যাঁচ দিতে হবে। এভাবে দু'দিক প্যাঁচানো শেষ হলে দুই দন্ডের মাঝে দড়ির যে অংশ আছে তাকে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে শক্ত করে অন্তত পক্ষে ৩-৪ বার প্যাঁচ দিতে হবে। দুই দন্ডের মাঝখানের দড়িকে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে প্যাঁচানোকে ফ্র্যাপিং (FRAPPING) বলে। ফ্র্যাপিং যত শক্ত হবে ল্যাশিং তত মজবুত বা শক্ত হবে।

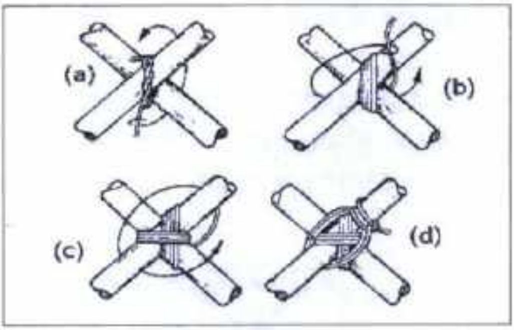

ফ্র্যাপিং দেওয়া শেষ হলে যে কোন দন্ডের সঙ্গে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে কোভ হিচ বেঁধে ল্যাশিং শেষ করতে হবে। এভাবে ডায়াগোনাল ল্যাশিং (DIAGONAL LASHING) বাঁধতে হয়। একটি বাঁশ বা দন্ডকে অপর একটি বাঁশ বা দন্ডের ওপর কোণাকোণিভাবে বা প্রায় কোণাকোণিভাবে রেখে বাঁধার জন্য ডায়াগোনাল ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়।

পোল এন্ড শিয়ার ল্যাশিং (POLE & SHEER LASHING)ঃ

দু'টি বাঁশ বা দন্ডকে একত্রে বেঁধে তাকে পায়া হিসেবে ব্যবহার করার জন্য অথবা একটি দন্ডকে অপর একটি বাঁশ বা দন্ডের সঙ্গে বেঁধে লম্বা করার জন্য এই ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়। যখন দু'টি দন্ডকে মাথার দিকে একত্রে বেঁধে লম্বা করা হয় তখন পোল বলে। মূলত শিয়ার লেগ এবং পোল তৈরির জন্য এই ল্যাশিং ব্যবহার করা

হয়। শিয়ার লেগ বা পোল তৈরির জন্য একই ল্যাশিং ব্যবহার করা হলেও এদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে সেটি হচ্ছে শিয়ার লেগ তৈরির জন্য ফ্র্যাপিং দিতে হয় এবং পোল তৈরির জন্য ফ্র্যাপিং দিতে হয় না।

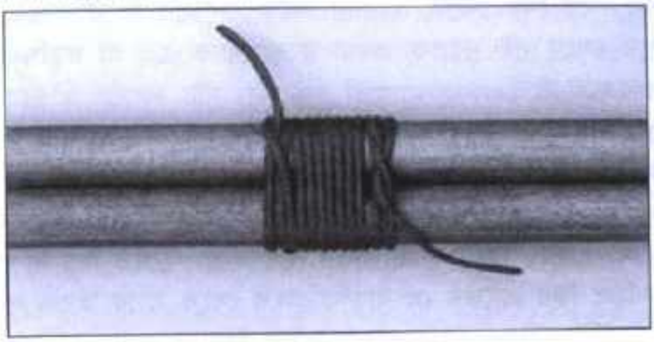

পোল এন্ড শিয়ার ল্যাশিংয়ের সাহায্যে কিভাবে শিয়ার লেগ এবং পোল তৈরি করা হয় নিম্নে পৃথকভাবে তার বর্ণনা দেওয়া হল।

শিয়ার লেগ তৈরি (SHEER LEG MAKING)ঃ

দু'টি বাঁশ দন্ডের নিচের অংশ এক বরাবর রেখে বাঁশ বা দন্ড দু'টিকে একত্র করে ওপরের যে কোন একটি বাঁশে দড়ির স্থির প্রান্ত দিয়ে একটি ক্লোভহিচ বা বড়শি গেরো বাঁধতে হবে। ক্লোভহিচ বা বড়শি গেরো বাঁধার পর দড়ির স্থির প্রান্তের যে বাড়তি অংশ থেকে যাবে তাকে দড়ির চলমান অংশের সঙ্গে পেঁচিয়ে দিতে হবে। এবার দড়ির চলমান অংশ দিয়ে দু'টি বাঁশ বা দন্ড একত্র করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নিচ থেকে ওপরে যেতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে দুই বাঁশ বা দন্ডের সঙ্গে প্যাঁচানোর সময় একটি দড়ি যেন অপর একটি দড়ির ওপরে উঠে না যায় এবং সেখানে যেন কোন ফাঁক না থাকে। আট দশ বার প্যাঁচানো শেষ হলে দুই দন্ডের মাঝখানে দড়ির যে অংশ তা অন্ততপক্ষে ৩-৪ বার পেঁচিয়ে দিতে হবে। দুই দন্ডের মাঝখানের দড়িকে চলমান অংশ দিয়ে প্যাঁচানোকে ফ্র্যাপিং (FRAPPING) বলে। ফ্র্যাপিং দেওয়া শেষ হলে প্রথমে যে দন্ডে ক্লোভ হিচ বা বড়শি গেরো দিয়ে ল্যাশিং শুরু হয়েছিল তার বিপরীত দন্ডে ক্লোভ হিচ বেঁধে ল্যাশিং শেষ করতে হবে। এভাবে শেয়ার লেগ তৈরি করার জন্য পোল এন্ড শিয়ার ল্যাশিং (POLE AND SHEER LASHING) বাঁধতে হয়। অনেকে এই ল্যাশিংকে কেবলমাত্র শিয়ার ল্যাশিং বলে।

পোল তৈরি (POLE MAKING)ঃ

একটি বাঁশ দন্ডের মাথার ২০ সে.মি. নিচে অপর একটি বাঁশ বা দন্ডের নিচের অংশ রেখে দন্ডকে আগের দন্ডের পাশাপাশি রাখতে হবে। এবার নিচে রাখা দন্ডটি যেখানে উপরের দন্ডের সঙ্গে মিলিত হয়েছে তার ৪-৫ সে. মি. ওপরে দু'টি দন্ডকে

একত্রিত করে সেখানে দড়ির স্থির অংশ দিয়ে একটি বড়শি গেরো বাঁধতে হবে। ক্লোভ হিচ বাঁধার পর দড়ির স্থির প্রান্তের যে বাড়তি অংশ থেকে যাবে তাকে দড়ির চলমান অংশের সঙ্গে পেঁচিয়ে দিতে হবে। এরপর দড়ির চলমান অংশ দিয়ে দুই দন্ডকে একত্র করে নিচ থেকে ওপরের দিকে পেঁচিয়ে দিতে হবে। ৮-১০ বার প্যাঁচানো হয়ে গেলে দুই দন্ডকে একত্র করে ক্লোভ হিচ বা বড়শি গেরো বেঁধে ল্যাশিং শেষ করতে হবে।

এরপর নিচের দন্ডটি উপরের দন্ডের সঙ্গে যেখানে মিলিত হয়েছে এবং যেখানে নিজের দন্ড শেষ হয়েছে তার ৪-৫ সে.মি. ওপর থেকে দুই দন্ডকে একত্র করে দড়ির এক প্রান্ত দিয়ে সেখানে একটি ক্লোভ হিচ বাঁধতে হবে। দড়ির যে প্রান্ত দিয়ে ক্লোভ হিচ বাঁধা হয়েছে সেটি হচ্ছে দড়ির স্থির প্রান্ত। ক্লোভ হিচ বা বড়শি গেরো বাঁধার পর দড়ির স্থির প্রান্তের যে বাড়তি অংশ থেকে যাবে তাকে দড়ির চলমান অংশের সঙ্গে পেঁচিয়ে দিতে হবে। এরপর দড়ির চলমান অংশ দিয়ে আগের মত দুই দন্ডকে একত্র করে ওপর থেকে নিচে প্যাঁচ দিতে হবে। ৮-১০ বার পেঁচানো হয়ে গেলে দুই বাঁশ বা দন্ডকে একত্র করে ক্লোভ হিচ বা বড়শি গেরো বেঁধে ল্যাশিং শেষ করতে হবে। দুই বাঁশ বা দন্ড যেখানে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে সেখানে আলাদা আলাদা ল্যাশিং দিলে সুবিধা হয়। তাতে বাঁধন অত্যন্ত শক্ত হয় এবং বাঁশ বা দন্ড কোন দিকে হেলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। এভাবে পোল তৈরি করার জন্য পোল এন্ড শিয়ার ল্যাশিং (POLE AND SHEER LASHING) বাঁধতে হয়। এক বা একাধিক দন্ডকে একত্রে জোড়া দিয়ে লম্বা করার জন্য পোল এন্ড শেয়ার ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়। অনেকেই এই ল্যাশিংকে পোল ল্যাশিং বলে।

(৩) বাঁশ ও দড়ির সাহায্যে গ্যাজেট তৈরিঃ

বাঁশ ও দড়ির সাহায্যে কিভাবে বিভিন্ন গ্যাজেট তৈরি করতে হয় সে সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল।

বিছানা রাখার গ্যাজেট ঃ

বিছানা রাখার জন্য প্রয়োজন মত এলাকায় চার কোণে চারটি খুঁটি মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। এবার ঐ খুঁটির লম্বালম্বিভাবে উপরের অংশের দু'পাশ থেকে দু'টি বাঁশ আড়াআড়িভাবে ঐ বাঁশ দু'টির সাথে রাখতে হবে। খুঁটি চারটি হবে পোল এবং

পরবর্তীতে খুঁটির সাথে যে দু'টি বাঁশ রাখা হয়েছে সে দু'টি হবে বার। এবার প্রত্যেক খুঁটিতে দড়ির একপ্রান্ত দিয়ে বড়শী গেরো বেঁধে বারের সাথে পোলকে জড়িয়ে স্কয়ার ল্যাশিং বাঁধতে হবে। এবার পোলের মাঝখানে ঐ একইভাবে দুই পাশ থেকে দু'টি বাঁশ রেখে বর্ণনা মত বার ও পোলের সাথে স্কয়ার ল্যাশিং বাঁধতে হবে। এভাবে বাঁধা হলে বারের উপর আড়াআড়িভাবে বাঁশের চটা বা সরু কোন বাঁশ রেখে ঐ বাঁশের চটা সরু বার হিসেবে ব্যবহৃত বাঁশের সাথে স্কয়ার ল্যাশিং দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। এভাবে বাঁধা শেষ হলে এটি বিছানা রাখার গ্যাজেট হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। দেয়া ছবি অনুকরণে অনুশীলন করলে সহজে স্কাউট ক্যাম্পে বিছানা রাখার গ্যাজেট তৈরি করা যেতে পারে।

শিকা তৈরি ঃ তিনটি বাঁশের চটি দিয়ে একটি ত্রিভুজ তৈরি করে ত্রিভুজের কোণগুলিকে পরস্পর চটিগুলির সাথে শক্ত সূতা/দড়ি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। ত্রিভুজের তিন কোনায় তিনটি দড়ি বাঁধা শেষ হলে ঐ দড়ি তিনটিকে একত্র করে গেরো দিতে হবে। এবার ঐ দড়ির আলগা মাথা কোন হুকের সাথে বা কোন গাছের ডালে বা কোন বাঁশের সাথে বা অন্যকোন কিছুর সাথে বেঁধে রাখতে হবে। এটার মাঝখানে কোন হাঁড়ি বা অন্য কোন পাত্র রেখে এটিকে শিকা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। দেয়া ছবি দেখলে এই শিকা তৈরির কৌশল সহজে বুঝতে পারা যাবে এবং পরবর্তীতে শিকা তৈরি করতে পারা যাবে।

হ্যাংগার ঃ ২-৪ সে.মি. ব্যাস বিশিষ্ট এবং ৩০-৪০ সে.মি. লম্বা একটি বাঁশের টুকরাকে প্রথমে মসৃণ করে নিতে হবে। এবার ঐ বাঁশের টুকরার ঠিক মাঝখানের অংশে কোন শক্ত সুতার মধ্যভাগ দিয়ে শক্ত করে বাধতে হবে। এভাবে বাধার পর সুতার দু'প্রান্ত একটু একটু বড় রেখে ঐ সুতা কোন কিছুর সাথে বেধে রাখতে হবে। এভাবে বাঁশের টুকরাকে সুতা দিয়ে বেঁধে হ্যাংগার তৈরি করা যায়। দেয়া ছবি অনুকরণে অনুশীলন করলে সহজে হ্যাংগার তৈরি করা যেতে পারে।

প্লেট রাখার র‍্যাক তৈরি ঃ

১ মিটার লম্বা এবং ২.৫ সে.মি. চওড়া বাঁশের দু'টি চটি সংগ্রহ করে চটি দু'টিকে লম্বালম্বিভাবে পরস্পরের ১৭-২০ সে.মি. দূরে রাখতে হবে। এবার ঐ চটির উপর ২-৩ সে.মি চওড়া চটি ১০-১৫ সে.মি. পর পর রেখে এই চটিগুলির দু'মাথা ঐ লম্বা চটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। যে ল্যাশিং দিতে হবে, সেগুলি হবে স্কয়ার ল্যাশিং। এভাবে বাঁধা শেষ হলে একটি লাঠি মাটিতে পুঁতে ঐ লাঠির ওপর এই চটিটি ৪৫ ডিগ্রি কাত করে রেখে ঐ লাঠির সাথে বেঁধে দিতে হবে। লম্বালম্বিভাবে চটির উপর আড়াআড়িভাবে রাখা চটির মাঝখানে প্লেট রাখা যেতে পারে। নিচে দেয়া ছবি দেখলে এই প্লেট রাখার র‍্যাক তৈরির কৌশল সহজে বোঝা যাবে এবং পরবর্তীতে প্লেট রাখার র‍্যাক তৈরি করা সম্ভব হবে।

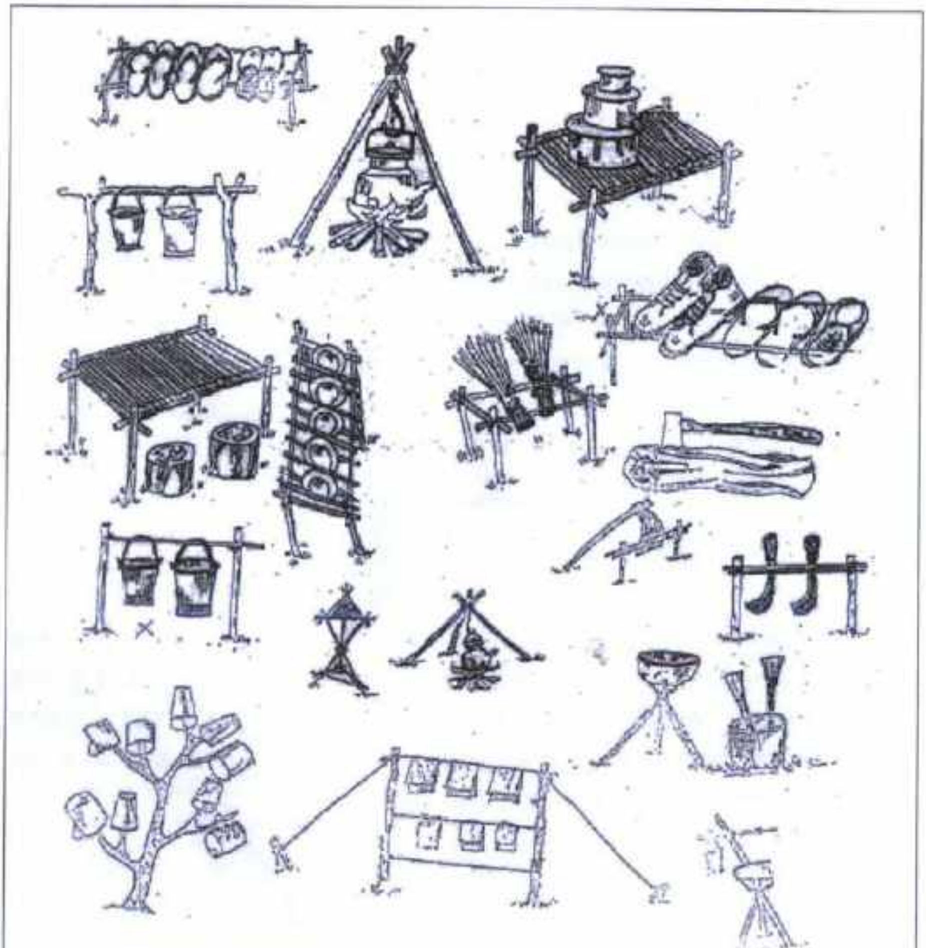

কম্পাস ও মানচিত্র পাঠ

১. একটি সাধারণ কম্পাসের গঠন এবং কম্পাস ব্যবহার করে দিক নির্ণয় করতে পারা।

কম্পাসের গঠনঃ আমরা জানি চুম্বকের ধর্ম সর্বদা পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ দিকে প্রান্ত রেখে অবস্থান করা। অর্থাৎ যে কোন চুম্বক দন্ডের প্রান্ত দুটি সর্বদা উত্তর দক্ষিণ দিকে অবস্থান করে। চুম্বকের এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে যে যন্ত্রের মাধ্যমে দিক নির্ণয় করা হয় তাকে কম্পাস বা দিক নির্ণয় যন্ত্র বলে। কম্পাসের উত্তর দিক এবং প্রকৃত উত্তর দিকের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকে। স্থান ভেদে এই পার্থক্যের কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে।

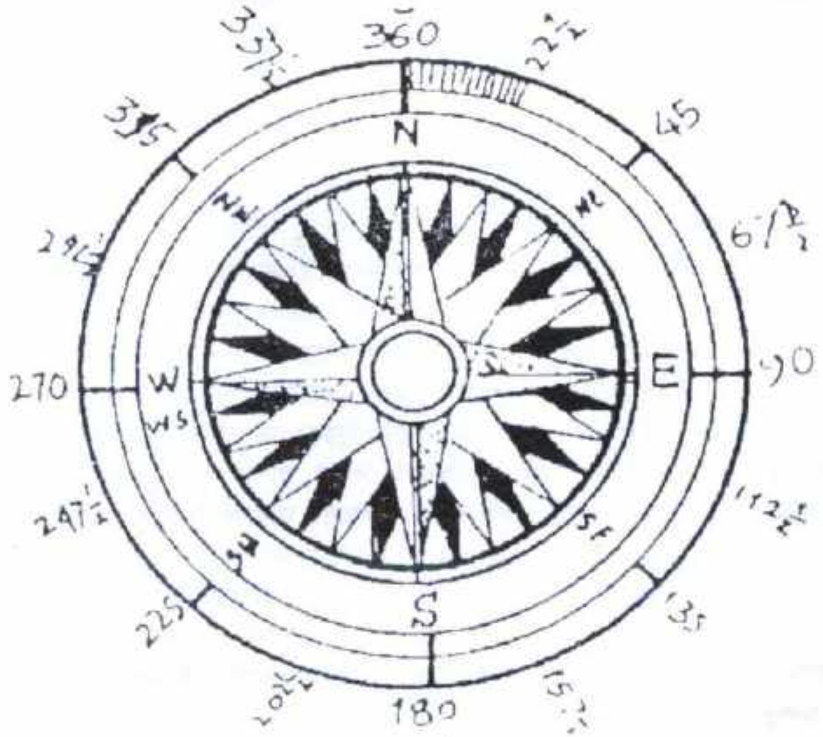

কম্পাসের উপরিভাগ কতকটা ঘড়ির কাঁটার মত। ঘড়ির কাঁটার মত সূচালো অগ্রভাগের দিকটায় উত্তর (N), দক্ষিণ (S), পূর্ব (E) এবং পশ্চিম (W) লেখা এবং ডিগ্রী ভাগ করা থাকে। ঘড়ির কাঁটার মত মোটা ও সূচালো এবং রং করা দিকটা সর্বদা উত্তর দিক নির্দেশ করে।

কম্পাসের চারিদিকের সমভাবে চারটি ভাগ, যথাক্রমে উত্তর (North), দক্ষিণ (South), পূর্ব (East) এবং পশ্চিম (West), যাদেরকে বলা হয় কার্ডিনাল পয়েন্টস (Cardinal points)। কার্ডিনাল পয়েন্টস ৪টি। এই কার্ডিনাল পয়েন্টস গুলোর মাঝ বরাবর কোনাকুনিভাবে দুটি করে ভাগ করলে তাদেরকে সাব-কার্ডিনাল পয়েন্টস বলে। এগুলো হলো উত্তর-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম। সাব-কার্ডিনাল পয়েন্টসগুলোকে আবার দুটো করে ভাগ করলে তাদেরকে সাব-সাব-কার্ডিনাল পয়েন্টস বলে। সাব-সব- কার্ডিনাল পয়েন্টস ৮টি। এগুলো হলো উত্তর-উত্তর-পূর্ব, পূর্ব-উত্তর-পূর্ব, পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিন-দক্ষিন-পূর্ব, পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিন-দক্ষিন-পশ্চিম, পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিম।

এই কৌনিক দিকগুলোকে নিম্নলিখিত ডিগ্রি-তে নির্দেশ করে সেই ডিগ্রি অনুযায়ী কম্পাসের কাটা রেখে দিক নির্ণয় করতে পারি। অর্থাৎ আমরা ০ ডিগ্রি কে উত্তর এবং ১৮০ ডিগ্রি কে দক্ষিণ দিক ধরে সেই দুটি ডিগ্রিতে কম্পাসের কাটা স্থাপন করলে আমরা অতি সহজেই বের করতে পারবো কত ডিগ্রিতে কোন দিকে যেতে হবে।

কম্পাসের সাহায্যে দিক নির্ণয় পদ্ধতি ঃ কম্পাসের সাহায্যে সঠিকভাবে দিক নির্ণয় করতে পারা তখনই সম্ভব হবে যখন কম্পাসকে সঠিকভাবে ও সঠিক দিকে রেখে স্থাপন করা যাবে। চুম্বকের স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী কম্পাসকে যেভাবেই রাখা হোক নো কেন কম্পাসের মধ্যকার চুম্বক শলাকাটি/কাটাটি সব সময়ই পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ দিক নির্দেশ এবং অপরটি হল ডায়ালের অন্যান্য অংশ নিয়ে অন্যান্য দিক নির্দেশ করে। যে কোন সমতল স্থানে বসিয়ে কম্পাসের মূল দেহটিকে ঘুরিয়ে কম্পাসের চুম্বক শলাক/কাঁটাটিকে (তীর চিহ্নিত প্রান্তটি উত্তর দিকে) কম্পাসের ডায়ালে নির্দেশিত উত্তর-দক্ষিণ দিকের সাথে একই সমান্তরাল রেখায় স্থাপন করে কম্পাসটিকে সেট করতে হবে। এভাবে কম্পাসটি সেট করে কম্পাসের ডায়ালে নির্দেশিত ডিগ্রীর সাথে কাঙ্খিত ডিগ্রী'র দিক মিলালে সঠিক দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে। এভাবেই নির্দেশিত দিক ধরে পথ এগিয়ে চলতে হবে। মনে রাখতে হবে কম্পাস সঠিকভাবে স্থাপন না করলে এবং সঠিক ডিগ্রী খুঁজে বের না করে পথ চলতে না পারলে সঠিক গন্তব্যস্থলে পৌছানো সম্ভব হবে না। তাই নির্ধারিত ডিগ্রী খুঁজে বের করে সেই ডিগ্রী ধরে পথ পথ চলা গুরুত্বপূর্ণ।

২. কম্পাসের সাহায্য না নিয়ে বায়ু প্রবাহ, চন্দ্র, সূর্য ও আকাশের তারার অবস্থান , * মসজিদ * মন্দির * কবরস্থান ইত্যাদির সাহায্যে দিক নির্ণয় করতে পারা।

কম্পাস না থাকলে বায়ুপ্রবাহ, চন্দ্র, সূর্য ও আকাশের তারা দেখে দিক নির্ণয় করা যায়। বায়ুপ্রবাহ, চন্দ্র, সূর্য ও আকাশের তারা দেখে কিভাবে দিক নির্ণয় করা যায় সে সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত বলা হলঃ

বায়ু প্রবাহ ঃ আমাদের দেশে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন দিক দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়। আমাদের দেশে কোন ঋতুতে কোন দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হয় সে সম্পর্কে নিম্নে বলা হলঃ

(ক) গ্রীষ্মকাল ও বর্ষাকাল ঃ দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম কোন থেকে।

(খ) শরৎকালঃ পূর্ব দিক থেকে।

(গ) হেমন্ত ও শীতকালঃ উত্তর ও উত্তর পূর্ব দিক থেকে

(ঘ) বসন্তকালঃ দক্ষিণ দিক থেকে।

এভাবে বিভিন্ন ঋতুতে প্রবাহিত বায়ু প্রবাহ দেখে আমাদের দেশে দিক নির্ণয় করা যায়। যেমনঃ কিছু শুকনো ধুলো বালি হাতে নিয়ে উপর থেকে সোজা ছেড়ে দিলে দেখা যাবে ধুলো বালিগুলো কোন দিকে উড়ে যায়। যে দিকে উড়ে যায় বুঝতে হবে সেদিকে বাতাস বইছে।

চন্দ্র ঃ আমাদের দেশে সূর্যাস্তের পরে চাঁদ পূর্ব দিকে উদিত হয় এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। এভাবে চাঁদ দেখে দিক নির্ণয় করা যায়।

সূর্য ঃ আমাদের দেশে সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয় এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। এভাবে সূর্য দেখে দিক নির্ণয় করা যায়।

আকাশের তারা ঃ আমাদের দেশে আকাশে যে সব তারা দেখা যায় তার মধ্যে কিছু কিছু তারা চেনা সহজ এবং ঐ তারা দেখে খুব সহজে দিক নির্ণয় করা যায়। নিম্নে এমনি ধরণের কিছু কিছু তারা সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হল। বিভিন্ন তারার অবস্থান দেখে দিক নির্ণয় করা যায়।

(১) ধ্রুব তারা ঃ ধ্রুব তারা আমাদের দেশে সন্ধ্যার সময় উত্তর আকাশে দেখা যায়। ধ্রুব তারা ঐ এলাকায় যে সব তারা দেখা যায় তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল। ধ্রুব তারার উজ্জ্বলতা দেখে অন্য তারা থেকে ধ্রুব তারার পার্থক্য খুব সহজে বোঝা যায় এবং খুব তাড়াতাড়ি ধ্রুব তারাকে চিহ্নিত করা যায়। আকাশের অন্যান্য তারা সারারাত সারা আকাশ ঘুরে বেড়ায় কিন্তু ধ্রুব তারা আকাশে স্থির থাকে। এই তারা দেখে পৃথিবীর উত্তর দিক নির্ণয় করা যায়। (The Month Star)

ধ্রুব তারা ছাড়া আকাশে নিম্নলিখিত নক্ষত্রমন্ডলী দেখা যায়। এই নক্ষত্রমন্ডলীর সাহায্যেও দিক নির্ণয় করা যেতে পারে।

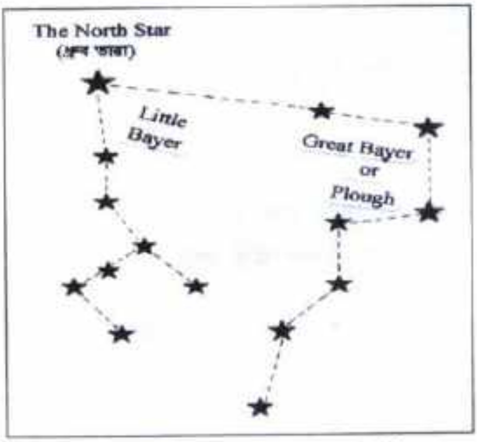

চিত্র : সপ্তর্ষিমন্ডলে (Great Bayer) লঘু সপ্তর্ষিমন্ডল (Little Bayer)

(২) সপ্তর্ষিমন্ডলঃ সাতজন প্রাচীন ঋষির নামানুসারে এই নক্ষত্রমন্ডলীর নামকরণ করা হয়েছে। এই নক্ষত্রমন্ডলীর আকৃতি অনেকটা হাল বা লাংগলের মত দেখায়। জ্যামিতির রেখা দিয়ে তারাগুলিকে যুক্ত করলে তা প্রায় একটি প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত দেখায়। এই নক্ষত্রমন্ডলীর দু'টি তারা মাথাপুলহ ও ক্রুতুকে একটি কাল্পনিক সরল রেখা দিয়ে টানলে ঐ সরল রেখাটি ধ্রুব তারাকে স্পর্শ করে।

সপ্তর্ষিমন্ডল আমাদের দেশে মাঘ ফাল্গুন মাসে উত্তর আকাশে দেখা যায়। সাতটি তারা নিয়ে গঠিত সপ্তর্ষিমন্ডলকে গ্রেট বেয়ারও (Great Bayer) বলা হয়।

(৩) **লিটল বেয়ার** ঃ ধ্রুব তারার কাছে ধ্রুব তারাসহ আরো সাতটি তারা দেখা যায়। আকাশের এই নক্ষত্রমন্ডলী সপ্তর্ষিমন্ডল থেকে বেশ ছোট বলে এই নক্ষত্রমন্ডলীকে লঘু সপ্তর্ষিমন্ডল বা লিটল বেয়ার (Little Bayer) বলে।

(৪) **ক্যাসিওপিয়া** ঃ ধ্রুব তারার যেদিকে সপ্তর্ষিমন্ডল অবস্থিত তার বিপরীত দিকে আরো একটি নক্ষত্রমন্ডলী দেখা যায়। এই নক্ষত্রমন্ডলীর তারাগুলিকে জ্যামিতিক রেখা দিয়ে যোগ করলে তা ইংরেজী বর্ণের মত দেখায়। এই নক্ষত্রমন্ডলীকে ক্যাসিওপিয়া বলে।

(৫) **কালপুরুষ** ঃ আমাদের দেশে পৌষ-মাঘ মাসে সন্ধ্যায় পূর্ব আকাশে শিকারী বেশে মানুষের আকৃতিতে একটি নক্ষত্রমন্ডলী দেখা যায়। এই নক্ষত্রমন্ডলীকে কালপুরুষ বলে। নক্ষত্রমন্ডলী কালপুরুষের তারাগুলি জ্যামিতিক রেখা দিয়ে টানলে তা প্রায় একটি মানুষের আকৃতি ধারণ করে।

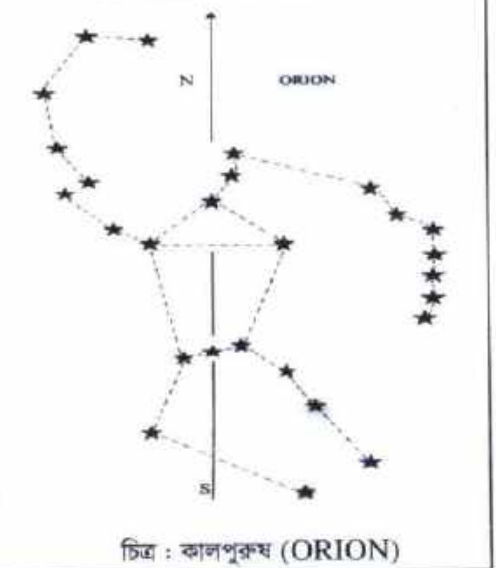

চিত্র : কালপুরুষ (ORION)

কালপুরুষের কোমর কল্পনা করা হয় মাঝের তিনটি তারাকে। কাল্পনিক কোমরের নিচের অংশের দু'দিকের তারাগুলিকে কালপুরুষ কল্পনা করা হয়। কালপুরুষের

উপরের দিকের দু'টি তারাকে কালপুরুষের ঘাড় হিসাবে কল্পনা করা হয়। ঘাড়ের উপরের দিকে যে তিনটি তারা আছে ঐ তারা তিনটিকে কালপুরুষের মাথা কল্পনা করা হয়। কালপুরুষের ঘাড়ের দু'পাশে যে তারাগুলির একটি মাথার উপরের দিকে এবং অপরটি কোমরের দিকে গিয়েছে সেই তারাগুলিকে কালপুরুষের হাত হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। কালপুরুষের মাথা হিসাবে যে তিনটি তারাকে কল্পনা করা হয়েছে সেই তারা থেকে কালপুরুষের মাথার দিকে রেখাটি লম্বা করলে তা ধ্রুব তারার সাথে মিশবে।

এইভাবে কালপুরুষের সাহায্যে দিক নির্ণয় করা যেতে পারে।

*** মসজিদ * মন্দির * কবরস্থান ইত্যাদির সাহায্যে দিক নির্ণয় করতে পারা।**

৩. মানচিত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন চিহ্ন ও স্কেল সম্পর্কে জানা।

স্কেল ঃ স্কেল হচ্ছে মূল ভূখন্ডের দূরত্বের সাথে মানচিত্রে প্রদর্শিত দূরত্বের আনুপাতিক হার। মানচিত্রে ব্যবহৃত ১ ইঞ্চি বা ১ সে.মি. এলাকা মূল ভূখন্ডের ১ মাইল অথবা ১০০০ কিলোমিটার অথবা ৫ মাইল বা ৫০০০ কিলোমিটার অথবা ১০০ মাইল বা ১০০০০০ কিলোমিটার ইত্যাদি।

চিহ্ন ঃ মানচিত্রে ব্যবহৃত সাংকেতিক চিহ্নসমূহকে কনভেনশনাল সাইন (CONVENSIONAL SIGN) বলে। নিম্নে মানচিত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন কনভেনশনাল সাইন দেখানো হল।

কনভেনশনাল সাইন বা প্রচলিত চিহ্ন

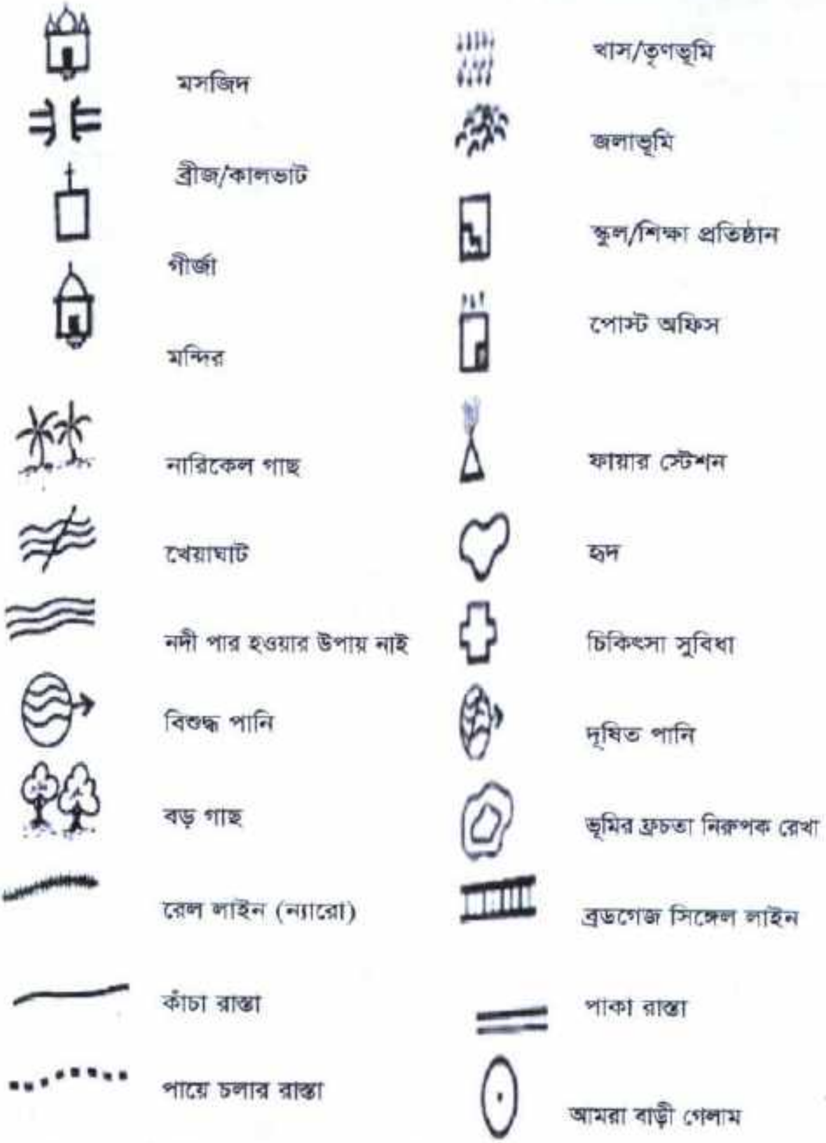

৪. ফিল্ড বুক তৈরি করতে পারা এবং ফিল্ড বুক অনুযায়ী ম্যাপ তৈরি করতে পারা।

ডিগ্রী ও কদম সম্বলিত পথ নির্দেশনাকে ফিল্ড বুক বলে। মানচিত্র অঙ্কন করার পূর্বে

কোন নির্দিষ্ট স্থানের খুটি নাটি তথ্য যে বইয়ে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে ফিল্ড বুক বলে। ফিল্ড বুক তৈরি হাইকিং এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যে পথে হাইক করা হবে ঐ পথের ফিল্ডবুক তৈরি করে নিরিবিলিতে বসে ঐ ফিল্ড বুকের সাহায্যে মানচিত্র তৈরি করতে হবে।

ফিল্ড বুক তৈরির পদ্ধতি ঃ

যে কাগজে ফিল্ড বুক তৈরি করা হবে তার ঠিক মাঝ বরাবর উপর থেকে নিচ পর্যন্ত এমন দু'টি সরল রেখা টানতে হবে যেন রেখা দু'টি পরস্পর ১-১ ইঞ্চি ব্যবধানে সমান্তরালে অবস্থান করে। এরপর একেবারে নিচের অংশে সরল রেখা দু'টির মধ্যখানে আরম্ভ লিখে বা "ক" অথবা "অ" লিখে ফিল্ড বুক তৈরি শুরু করতে হয় এবং শেষ অংশে শেষ বা "খ" বা "আ" দিয়ে শেষ করতে হবে। ডিগ্রী পরিবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত দূরত্ব ফিল্ড বুকে নোট করতে হয়। পরবর্তীতে যেখানে ডিগ্রীর পরিবর্তন তাও ফিল্ড বুকে লিখে রাখতে হয়। এই দূরত্ব স্কাউটরা কদম মেপে (১২০ কদম = ১০০ গজ প্রায়) ফিল্ড বুকে লিখে থাকে। তাছাড়া কোন নির্দিষ্ট ডিগ্রীতে পথ অতিক্রমের সময় রাস্তার ডান ও বামের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফিল্ড বুকের ডানে ও বামে লিখে রাখতে হবে।

মনে রাখতে হবে হাইকার যে দিকে অগ্রসর হবে কাগজের অঙ্কিত ফিল্ড বুক তার পথেরই প্রতিকৃতি। দূরত্ব অতিক্রমকালে যদি ডানে বা বামে কোন বিশেষ লক্ষনীয় কিছু থাকে যেমন- রাস্তা, মসজিদ, মন্দির, বিদ্যালয়, কল-কারখানা, হাসপাতাল, পানির কল ইত্যাদির উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে কনভেনশনাল সাইন ব্যবহার করতে হয়। মনে রাখতে হবে যে, ফিল্ড বুক ব্যবহারের সময় নিচ থেকে শুরু করতে হয়।

উহফ
৩২৭ ঝ ৯০°
২৩৩ ঝঃ. ০°
১৬০ ঝঃ. ৩০০°
২৭৫ ঝঃ. ২৭০°
২২৭ ঝঃ. ৩৩০°
২৬৬ ঝঃ. ৩০°
২৫৩ ঝঃ. ০°
ঝঃধৎঃ

ঝঃ. = কদম (ঝঃবঢ়)

ফিল্ড বুক (নমুনা)

মানচিত্র অঙ্কন ঃ একটি মানচিত্র অঙ্কনকালে সর্বাগ্রে উপর দিকে উত্তর দিক নির্দেশনা চিহ্ন এবং সংকেতের উলেখ করে নিতে হয়। তারপর ফিল্ড বুক এর নির্দেশিত ডিগ্রী অনুসারে দূরত্ব এবং মানচিত্রে নির্দেশিত স্কেলের অনুপাতে দূরত্ব নির্ণয় করে যে কাগজে মানচিত্র আঁকা হচ্ছে ঐ কাগজের প্রারম্ভিক বিন্দু নির্ধারণ করে কম্পাসের সাহায্যে ফিল্ড বুকে উল্লিখিত দিকে সূক্ষ্ম রেখা টানতে হবে। এভাবেই ফিল্ড বুকের বর্ণিত দিক ও দূরত্ব সমাপ্ত করলে একটি রেখা মানচিত্র পাওয়া যাবে। এই অঙ্কনকালে ফিল্ড বুকের ডানে ও বামে যে চিহ্নগুলি উলেখ রয়েছে এই রেখাচিত্রের উভয় পাশে সে সকল চিহ্ন বসাতে হবে। মানচিত্র আঁকার জন্য ৪টি দিকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। যেমন: D= Direction, D=Distance, D=Details, D=Difference in height

মানচিত্র পাঠ ঃ মানচিত্র পাঠ করতে হয় নিজের জন্য এবং আঁকতে হয় অপরের জন্য। মানচিত্রে ব্যবহৃত "কনভেনশনাল সাইন" সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা না থাকলে মানচিত্র পাঠ করা যাবে না এবং মানচিত্র অনুসরণ করে লক্ষ্যস্থলে পৌছানো যাবে না। মানচিত্রে ব্যবহৃত "কনভেনশনাল সাইন" সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হয়ে সঠিকভাবে মানচিত্র অনুসরণ করতে পারাকে "মানচিত্র পাঠ" বুঝায়। মানচিত্র সঠিকভাবে অনুসরণ করে চলার জন্য প্রথমে প্রয়োজন সঠিকভাবে মানচিত্র সেট করতে পারা। মানচিত্র সঠিকভাবে সেট করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে মানচিত্রে প্রদর্শিত উত্তর দিক এবং মূল ভূ-খন্ডের উত্তর দিক একই দিকে রেখে মানচিত্রে প্রদর্শিত কোন নির্দিষ্ট রাস্তাকে মূল ভূ-খন্ডের সেই নির্দিষ্ট রাস্তা সমান্তরালভাবে স্থাপন করা।

৫. কম্পাস ও ফিল্ড বুক অনুসরণ করে একটি ভ্রমণে অংশগ্রহণ এবং সময়, আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও মানচিত্র তৈরি করা ঃ

কম্পাস ও ফিল্ড বুক অনুসরণ করে পথ চলার জন্য প্রথমে অবস্থান স্থান থেকে ফিল্ড বুকে দেয়া ডিগ্রী নির্ধারিত করে নিয়ে পথ চলতে হবে। ফিল্ড বুক অনুসরণ করে পথ চলার সময় রাস্তার দুপাশের উলেখ যোগ্য ল্যান্ড মার্কগুলি নোট করে নিতে হবে। এই ল্যান্ড মার্কগুলি পরস্পরের থেকে কত দূরে অবস্থিত এবং ল্যান্ড মার্কগুলি রাস্তার কোন কোন ধারে অবস্থিত তাও সযত্নে নোট করে নিতে হবে। কারণ এগুলো পরবর্তীতে মানচিত্র অংকনে প্রচুর সহায়তা করবে।

তারিখ	স্থান	সময়	আবহাওয়া	দূরত্ব	পথের বর্ণনা	মানচিত্র	মন্তব্য

মানচিত্র তৈরি ঃ ফিল্ড বুক অনুযায়ী মানচিত্র তৈরি করতে হলে আগে যেভাবে মানচিত্র তৈরির কথা বলা হয়েছে সেইভাবে মানচিত্র তৈরি করতে হবে। একটু অনুশীলন করলে মানচিত্র তৈরি করা সহজ হয়ে উঠবে।

(গ) গোপন বার্তা উদ্ধার ঃ

(১) টেক্সট, কোড ও সাইফার কি? এ সম্পর্কে ধারনা অর্জন।

টেক্সট ঃ টেক্সট (Text) বলতে বুঝায় অক্ষর বা শব্দের আদি রূপ অর্থাৎ যে বর্ণ বা শব্দ সমূহকে কোড করা হয়েছে।

কোড ঃ কোন অক্ষর বা শব্দ যার গোপন অর্থ আগে থেকেই ঠিক করে রাখা হয়, অর্থাৎ কোন খবরকে গোপন করে পাঠানোর জন্য যে বর্ণ বা শব্দ সমূহকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্যবহার করা হয় তাকে কোড বলা হয় (Code)।

সাইফার ঃ সাইফার (Cypher) মানে শূন্য বা অর্থহীন। কোন লেখা বা খবরকে অন্যের কাছ থেকে গোপন করে তৃতীয় কোন ব্যক্তির কাছে পাঠাবার পদ্ধতিকে সাইফার বলে। অর্থাৎ যে পাবে এবং যে দেবে, এ দুজন ছাড়া অন্যের কাছে সেই লেখাগুলি অর্থহীন বলে মনে হবে।

(২) গোপন বার্তা উদ্ধারের দু'টি নিয়ম নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

চাবি বা কী পদ্ধতি (KEY METHOD) ঃ ইংরেজী বর্ণমালার সর্বশেষ বর্ণ 'জেড' কে বাদ দিয়ে যে কোন একটি বর্ণকে চাবি হিসেবে ধরতে হবে। মনে করি 'E' বর্ণকে চাবি হিসেবে ধরা হয়েছে। 'E' বর্ণকে চাবি হিসেবে ধরা হয়েছে বলে 'A' বর্ণের পরিবর্তে 'E' বর্ণের ব্যবহার করা হবে।

এবার কাজের সুবিধার জন্য বর্ণগুলিকে নিম্নে ছকে বিন্যাস করতে হবেঃ

CYPHER	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
TEXT	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q

N	O	P	Q	R	S	T	U	V
R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

এভাবে ছক তৈরি হয়ে গেলে মূল ম্যাসেজের টেক্সট এ যে বর্ণ আছে এই ছকের সেই বর্ণের উপর যে বর্ণ আছে তা লিখে কোড তৈরি করতে হবে। মনে করি এই পদ্ধতিতে COME HERE বাক্যটি কোডের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। এক্ষেত্রে কোডটি হবে নিম্নরূপঃ YKIA DANA.

কোড থেকে ডিকোড করার জন্য ঐভাবে বর্ণমালা দিয়ে ছক তৈরি করে নিয়ে কোড এ দেয়া বর্ণমালার নিচে যে টেক্সট আছে তা বসালে কোড থেকে ডিকোড করা যাবে।

উল্টো হরফ পদ্ধতি (REVERSE METHOD) ঃ ইংরেজী বর্ণমালাকে পিছন থেকে লিখতে হবে। যেমন Z হরফ হবে 'A' Y হবে 'B' X হবে 'C' ইত্যাদি ছকে সাজালে দাঁড়াবেঃ

CYPHER	Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	Q	P	O	N	M	L	K	J
TEXT	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q

I	H	G	F	E	D	C	B	A
R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

(ঘ) বিশ্ব বন্ধুত্ব কার্যক্রম ঃ

১. কমপক্ষে একজন বিদেশী স্কাউট অথবা স্থায়ীভাবে বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশী স্কাউট অথবা নিজ জেলা (বসবাসরত) ব্যতীত অন্য বিভাগের

৩ জেলার ৩ জন স্কাউট/স্কাউটার অথবা উপজাতীয় ২ জন স্কাউটের সাথে ন্যূনতম ছয় মাস বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং ডাক/ফ্যাক্স/ই-মেইল ইত্যাদির মাধ্যমে পত্র আদান-প্রদান করা।

২. আদান-প্রদানকৃত পত্রের অন্যূন ২ টি (২ টি আউট গোয়িং ও ইনকামিং) কপি লগ বইয়ে সংযুক্ত করতে হবে।

৩. চিঠি-পত্র অথবা অন্য কোন মাধ্যমে স্কাউট নয় অন্তত: এমন একজনকে স্কাউটিংয়ে উদ্বুদ্ধ করা।

কম্পিউটার সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানার্জন

(ক) কম্পিউটারের ইতিহাসঃ

কম্পিউটার আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় হিসাব এবং তথ্য সংরক্ষণের চাহিদা থেকে। মানুষ যখন ব্যবসা বাণিজ্যি শুরু করে তখন দরকার হয় হিসাব কার্যের এবং তথ্য সংরক্ষণের। শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষ হিসাবরক্ষণ ও ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য নুড়ি, ঝিনুক, হাড়ের আঙ্গুল, দড়ির সিট ইত্যাদি ব্যবহার করেছে। সর্বপ্রথম মানব সভ্যতা হিসাবে পরিচিত সুমেরিয় সভ্যতার (খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ থেকে ১২০০) রাজকীয় হিসাব কাদামাটির ফলকে লিপিবদ্ধ করা হতো। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ সালে ব্যাবিলনে সবচেয়ে পুরানো হিসাব যন্ত্র এ্যাবাকাস আবিষ্কার করা হয়।

১৮২১ সালে ইংল্যান্ডের চার্লস ব্যাবেজ ব্রিটিশ সরকারের আর্থিক অনুদানে বিয়োগ ভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় হিসাব যন্ত্র ডিফারেন্স ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রটিকে সর্বপ্রথম স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটার ক্যালকুলেটর হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৮৩৪ সালে যে কোন হিসাব কার্যে সক্ষম অ্যানালিটিক্যাল মডেল ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রটি আধুনিক কম্পিউটারের সাথে অনেক মিল্ ছিল। সর্বপ্রথম এরূপ ধারণা এবং পরিকল্পনার জন্য চার্লস ব্যাবেজকে কম্পিউটারের জনক বলা হয়। ইংরেজ কবি লর্ড বায়রনের কন্যা এ্যাডা অগাষ্ট বায়রনকে অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনের সর্বপ্রথম সফটওয়্যার প্রোগ্রামার হিসেবে গণ্য করা হয়।

আধুনিক কম্পিউটারের ভিত্তি হচ্ছে ডিজিটাল বাইনারী সার্কিট। ১৯৪১ সালে জার্মানীর কনয়াড জিউস নির্মাণ করেন সর্বপ্রথম প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রিত তাড়িৎযান্ত্রিক কম্পিউটারের ১৯৪৪ সালে হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় আই.বি.এম.এর যৌথ প্রচেষ্টায়

সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল কম্পিউটার Mark-1 নির্মাণ করেন। ১৯৪৫ ব্যালিস্টিক রিসার্চ ল্যাব এর অনুদানে জন ভন নিউম্যান বাইনারী পদ্ধতি ব্যবহার এবং ডাটা নির্বাহ ও সংকেত মজুত করতে সক্ষম EDVAC কম্পিউটার তৈরির প্রস্তাব দেন। তাঁর এই প্রস্তাবিত স্থাপত্য আজও আধুনিক কম্পিউটার "ভন নিউম্যান" স্থাপত্য নামে পরিচিত। এ কারনে ভন নিউম্যানকে আধুনিক কম্পিউটারের জনক বলা হয়। কালের বিবর্তনে কম্পিউটার একটি স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ইলেকট্রিক যন্ত্রে পরিনত হয়েছে। এই কম্পিউটার প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক হচ্ছে। কম্পিউটারের ইতিহাসও সাথে সাথে সমৃদ্ধ হচ্ছে। কম্পিউটারের ইতিহাস সংক্রান্ত উপরের তথ্যগুলো ধারণা মাত্র। এই বিষয়ে অধিকতর জানার জন্য ক্রচ মাধ্যমিক কম্পিউটার শিক্ষা, ব্যবসায় কম্পিউটার অথবা যে কোন কম্পিউটার ইতিহাস সংক্রান্ত বই-পুস্তক পাঠ করা যেতে পারে।

(খ) অপারেটিং সিস্টেমঃ

কম্পিউটারকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য যে সফট্ওয়ার অর্থাৎ প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রাম সমষ্টি ব্যবহৃত হয় ঐগুলোকে একসাথে বলা হয় অপারেটিং সিস্টেম (Operating System সংক্ষেপে OS)। অপারেটিং সিস্টেম ছাড়া কোন কম্পিউটারই চালু করা যায় না। আমেরিকান ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইন্সটিটিউটের (American National Standards Institute-ANSI) মতেঃ অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে এমন একটি সফ্টওয়্যার যা কম্পিউটার প্রোগামের এক্সিকিউশনকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং যা সিডিউলিং, ডিবাগিং, ইনপুট/আউটপুট কন্ট্রোল, একাউন্টিং, কম্পাইলেশন, সেটারেজ অ্যাসাইনমেন্ট, ডেটা ম্যানেজমেন্ট এবং আনুষঙ্গিক কাজ করে থাকে।

১৯৫১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (USA) জেনারেল মটর রিসার্চ ল্যাবরেটরী কর্তৃক IBM Crop এর জন্য সর্বপ্রথম অপারেটিং সিস্টেম আবিষ্কৃত হয়। ইহা তখন মেইনফ্রেম কম্পিউটারে ব্যবহার করা হতো। অপারেটিং মিস্টেম পিসিতে ১৯৭১ সাল থেকে ব্যবহার শুরু হয় যা CP/M নামে পরিচিতি।

বর্তমানে মাইক্রো কম্পিউটার বা পিসিতে বহুল ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেমগুলো হলো- MS-DOS, PC-DOS, MS WINDOWS 95/98/2000, UNIK, XENIX, LINUX, Mac OS, MS WINDOWS NT, MS WINDOWS XP/VISTA, OS/2Warp, Solaries ইত্যাদি।

অপারেটিং সিস্টেমের গুরত্বঃ

অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটারের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে। ইহা কম্পিউটার ও ব্যবহারকারীর মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে। অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমেই ব্যবহারকারী কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে ও এর ব্যবহারিক সফট্ওয়্যার চালাতে সময় হয় ও তার আকৃতি বিবিধ কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হয়। কাজেই অপারেটিং সিস্টেম ছাড়া কম্পিউটার সিস্টেম মূল্যহীন যন্ত্র।

ইউজার ইন্টারফেসঃ

ইউজার ইন্টারফেস অপারেটিং সিস্টেমের এমন একটি অংশ যা ব্যবহারকারীর সাথে বিভিন্ন সফট্ওয়্যারগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন প্রোগাম লোড করা ও কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে। অপারেটিং সিস্টেমে সাধারণত তিন ধরণের ইউজার ইন্টারফেস দেখা যায়। যথা-কমান্ড চালিত, মেনু চালিত ও গ্রাফিক্যাল ইউজার এন্টারফেস।

রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ঃ

অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটারকে সচল ও ব্যবহার উপযোগী করে তোলে। ইহা কিম্পউটারের বিভিন্ন রিসোর্স যেমন ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস (প্রিন্টার, ফপি/হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ, মাউস, মনিটর ও কীবোর্ড ইত্যাদি) ও অন্যান্য ডিভাইসগুলোর নিয়ন্ত্রণ, ত্রুটি ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং সমন্বয় সাধন করে। তাছাড়া মেমরি ম্যানেজমেন্ট করে কম্পিউটারের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

সিকিউরিটিঃ

অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটারের রিসোর্সকে সাধারণ/অনাকাঙ্খিত ব্যবহারকারীর হাত থেকে রক্ষা করে। ইহা ডেটা ও ইনফরমেশন চুরি থেকেও রক্ষা করে।

টাস্ক ম্যানেজমেন্টঃ

অপারেটিং সিস্টেমের টাস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম ব্যবহারকারীর নির্দেশ গ্রহণ, বিশেষণ এবং ব্যাচ প্রসেসিং করে। সিপিইউর টাইম্লাইসকে বিভিন্ন টাস্কের মধ্যে বন্টন করে এবং ইন্টারাপ্ট কন্ট্রোল করে যাতে সকল টাস্কই সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়।

ফাইল ম্যানেজমেন্টঃ

অপারেটিং সিস্টেম ফাইল ম্যানেজমেন্ট যেমন ফাইল তৈরি, ডিলেট, অ্যাকসেস, কপি, মুভ, সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজ করে থাকে। তাছাড়া ডেটা ও প্রোগ্রাম ম্যানিপিউলেশন (Manipulation) যেমনঃ- ডেটা আদান-প্রদান, স্থানান্তর, ও সংরক্ষণের কাজ করে থাকে।

ইউটিলিটিসঃ

অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারকারীকে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা যেমন-ফাইল ডিফ্রাগমেন্টেশন, ডেটা কম্প্রেশন, ব্যাকআপ, ডেটা রিকোভারি, এন্টি-ভাইরাস ইউটিলিটিস ইত্যাদি প্রদান করে।

উদাহরণঃ MEET ROVER SCOUT LEADER FIVE খবরটি পাঠাতে হলে M এর পরিবর্তে লিখতে হবে 'N;E-এর পরিবর্তে হবে 'V;T এর পরিবর্তে করতে হবে এ, তাতে MEET-এর পরিবর্তে হবে NVVG। এভাবে খবরটি হবে NVVG ILEVI HXLFG OVZWVI UREV. আবার সাইফার পেলে WL MLG TL ডিকোড করলে হবে DO NOT GO.

১১। রোভার স্কাউটদের জন্য নির্বাচিত গান থেকে ৪টি গান জানা ও সুন্দর ভাবে গাইতে পারা।

মার্চিং সং ঃ চলে মচ্ মচ্

চলে মচ্ মচ্, চলে মচ্-মচ, বাম ডান মচ্-মচ্
সবচেয়ে ভালো পা-গাড়ী (২)

ট্রামে বাসে চড়িনা বড় ঝাকমারি
ট্রেনে তে চড়িনা হয় পাড়াপাড়ি।
চলে মচ্ মচ্ পা গাড়ী।

প্লেনেতে চড়িনা যায় গড়াগড়ি
স্টীমারে চড়িনা জলে যায় ভারি
চলে মচ্ মচ্ ....পা গাড়ী।

ট্যাক্সীতে চড়িনা লাগে টাকা বেশী
ঘোড়াতে চড়িনা ভয় হয় বেশী।
চলে মচ্ মচ্ ....পা গাড়ী

ট্যাম্পোতে চড়িনা হয় ঠেসাঠেসি
হোন্ডাতে চড়িনা হয় পিসা পিসি।
চলে মচ্ মচ্ ....পা-গাড়ী।

সাইকেলে চড়িনা, উল্টে যায় পড়ি
নৌকাতে চড়িনা, ডুবে যায় তরী
চলে মচ্ মচ্ ....পা গাড়ী

হাতীতে চড়িনা আছড়ে যদি মারে
ধুক-ধুক করে প্রাণ, কেবল্ কারে।
চলে মচ মচ ....পা-গাড়ী (২)

চলে মচ্ মচ্ পা----------- গাড়ী
হাতীতে চড়িনা আছড়ে যদি মারে
ধুক ধুক করে প্রাণ, কেবল কারে।
আমি অকুলে দিয়েছি পাড়ি
জাত কুলমান ত্যাজ্য করে বলে বপিন।
বাবা তোমার নাম ভরসায়
আমি কুলে দিয়েছি সাঁতার
নজরুল কান্দে গানের ছন্দে
লইতে তোর খবর।
চলে মচ্ মচ্ পা----------- গাড়ী (২)

মুর্শিদী গান

দয়াল বাবা কেবলা কাবা
আয়নার কারিগর
আয়না বসাইয়া দে মোর
কলভের ভিতর বাবা রে।
আমার বাবা আল হাছানী
যার কাছে মারফতের খনি
তলব হইয়া যায় মুরালী দেখলে এক নজর। (আংশিক)

প্রোগ্রাম অনুযায়ী কমপক্ষে যে কোন ১টি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন ঃ

০ হাঁস পালন, মুরগী পালন, মৎস্য চাষ, ক্ষেতের পাওয়ার পাম্প মেরামত করা, উন্নত চুলা তৈরি, বায়োগ্যাস প্যান্ট, বক্তৃতা, সম্পাদকের কাজ, দোভাষী, মোটর যান, এ্যামেচার রেডিও, এ্যারো পাইওনিয়ারিং, নৌবাহিনী সংগঠন, রেলওয়ে ট্রাফিক কন্ট্রোল, কৃষি কর্ম, মৌমাছি চাষ, মাশরুম চাষ, সয়েল টেস্ট, এ্যাকুরিয়ামে মাছ চাষ। বিষয়গুলোর বিস্তারিত রোভার প্রোগ্রাম বইয়ে উল্লেখ করা আছে।

উল্লিখিত বিষয়গুলোতে দক্ষতা অর্জন করার জন্য উল্লিখিত বিষয়ে বিশেষভাবে পারদর্শী ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে যথাযথ প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। বিভিন্ন জেলা রোভার স্কাউটস এই বিষয়গুলোর উপর বিশেষ কোর্সের আয়োজন করে থাকে। রোভারেরা উক্ত কোর্সে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে এ সকল বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

ধর্মীয় কার্যাবলী

১২। ধর্মীয় কার্যাবলী ও মূল্যবোধ ঃ

(ক) নিজ নিজ ধর্মে পালনীয় বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও চর্চা।

একজন রোভারকে তার নিজ ধর্মের পালনীয় বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে সবিশেষ জানতে হবে এবং নিজ ধর্মের আচার আচরণ নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করতে সব সময় সচেষ্ট থাকতে হবে। নিজ ধর্মের পালনীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে কোন রোভার অসচেতন হতে পারবে না। তাকে তার নিজ ধর্মের বিধি অনুযায়ী যাবতীয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান যথাযথভাবে অবশ্যই পালন করতে হবে।

ইসলাম ধর্ম

আশুরাঃ ১০ই মুহররমকে মুসলমানেরা আশুরা হিসেবে পালন করে । এদিন নীতির প্রশ্নে আপোষহীন হবার প্রতিজ্ঞা করে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর দৌহিত্র ইমাম হোসেন (রাঃ) কারবালার প্রান্তরে প্রাণ দিয়েছিলেন। তাই মুসলমানেরা এদিনকে বরণ করেছে শোক দিবস হিসেবে।

ফাতেহা-ই-ইয়াজ দিহামঃ ১২ই রবিউল আউয়াল দিনটি মুসলমানের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ মহানবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) এদিনই জন্ম নিয়েছিলেন আবার হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) এর ওফাত দিবস। এ দিনটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ।

শব-ই-মেরাজঃ ২৭ শে রজব। এ দিনের রাতে বোরক নামক বাহনে চড়ে হযরত মুহম্মদ (সঃ) মক্কা থেকে বায়তুল মোকাদ্দস পর্যন্ত যান। সেখানে সকল নবীদের সাথে সাক্ষাৎ শেষে সাত আসমান সফর করে বেহেস্ত, দোযখ সব কিছু দেখেন। এদিন পাঁচওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়। এজন্য এ রাত্রি অতি পূণ্যময়।

শব-ই-বরাতঃ ১৪ ই শা'বান দিবাগত রাতকে শব-ই-বরাত বলে অভিহিত করা হয়। এ রাতে আল্লাহ মানুষের মোনাজাত কবুল করেন। এটি অত্যন্ত মহিমাময় এবং পবিত্রতম রাত্রি।

শব-ই-কদর ঃ রমজান মাসের শেষ দশদিনের যে কোন রাতে আল্লাহ পবিত্র কোরআন নাযিল করেন। অধিকাংশ আলেমগণের মতে এ রাত ২৭ শে রমজান দিবাগত রাত। এ রাতকে আল্লাহ হাজার রাত্রির চেয়েও উত্তম বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন।

জুমাতুল বিদা ঃ রমজান মাসে শেষ শুক্রবারকে জুমাতুল বিদা বলে। এদিন আল্লাহ মানুষের মোনাজাত কবুল করেন।

ঈদ-উল-ফিতর ঃ পহেলা শাওয়ালকে ঈদ-উল-ফিতর হিসেবে পালন করা হয়। দীর্ঘ এক মাস রোজা রাখার পর এ দিনে সবাই আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে।

ঈদ-উল-আযহা ঃ ১০ই জিলহজ্জ ঈদ-উল-আয়হা পালন করা হয়। এ দিন আনন্দের পাশাপাশি বিধান অনুযায়ী পশু কোরবানি করা হয়।

(খ) স্কাউটস ওনঃ

'স্কাউটস ওন' স্কাউটদের নিজস্ব একটি কর্মসূচি। এই কর্মসূচি একমাত্র স্কাউটরা পালন করে থাকে। স্কাউটদের আত্মীক উন্নয়ন, তাদেরকে ধর্মভীরু, সৎ, চরিত্রবান মানুষরূপে গড়ে তুলতে স্কাউটস ওন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্কাউটস ওন কোন ধর্মীয় মজলিশ বা মাহফিল নয়। স্কাউটস ওন এ অংশগ্রহণ ঐচ্ছিক। স্কাউটস ওন এ স্কাউটরা ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিদের জীবনের ছোট ছোট ঘটনার কথা উলেখ করে স্কাউট আইন এবং প্রতিজ্ঞার কোন অংশের সাথে তাদের ঐ ঘটনাগুলি সম্পর্কিত সে সম্পর্কে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে বক্তব্য রাখে।

'স্কাউটস ওন' এর কর্মসূচি হতে হবে সার্বজনীন এবং অনুষ্ঠানের পরিবেশ হতে হবে অত্যন্ত পূত পবিত্র। সকলকে পূত-পবিত্র হয়ে 'স্কাউটস ওন' এ যোগদান করতে হবে। যদি কোন ইউনিটের সকল সদস্য একই ধর্মাবলম্বী হয় তাহলে স্কাউটস ওন এর কর্মসূচির সাথে তাদের নিজ ধর্ম মত অনুযায়ী ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্কাউটস ওন শেষ করতে পারবে। তবে ঐ ইউনিটের যদি একজন সদস্য ও অন্য ধর্মাবলম্বী হয়, তাহলে আর এভাবে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'স্কাউটস ওন' শেষ করা যাবে না। নিম্নে সার্বজনিন স্কাউটস ওন এর একটি নমুনা কর্মসূচি দেয়া হলঃ

নং	বিষয়	দায়িত্ব
১.	স্কাউট ওনের উদ্বোধন	সভাপতি
২.	স্কাউট ওনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা	রোভার স্কাউট লিডার
৩.	পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত	রোভার স্কাউট
৪.	ত্রিপিটক পাঠ	রোভার স্কাউট
৫.	গীতা পাঠ	রোভার স্কাউট
৬.	বাইবেল পাঠ	রোভার স্কাউট
৭.	উপাক্ষান (ইসলাম)	রোভার স্কাউট
৮.	উপাক্ষান (সনাতন)	রোভার স্কাউট
৯.	উপাক্ষান (খ্রিষ্ট)	রোভার স্কাউট
১০.	উপাক্ষান (বৌদ্ধ)	রোভার স্কাউট
১১.	হামদ	রোভার স্কাউট
১২.	নাত	রোভার স্কাউট
১৩.	ভক্তিমূলক গান	রোভার স্কাউট
১৪.	স্কাউট প্রতিজ্ঞা পুনঃপাঠ	রোভার স্কাউট লিডার
১৫.	স্কাউটস ওন এর মূল্যায়ন	গ্রুপ স্কাউট লিডার
১৬.	প্রার্থনা ও সমাপ্তি ঘোষণা	সবাই

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলকে মিষ্টি খাওয়ালে ভাল হয়।

(উল্লিখিত কর্মসূচি ইউনিটের প্রয়োজনে পরিবর্তন করা যেতে পারে)।

১৩। স্কাউটিং ও সেবা কার্যক্রম ঃ

(ক) তাঁবু বাস সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ঃ

তাঁবুবাসের উদ্দেশ্যে ঃ তাঁবু বাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুক্তাঙ্গনে অনন্দঘন পরিবেশে ক্রু মিটিংয়ে শেখা বিষয়বস্তুর ব্যবহারিক অনুশীলনের মাধ্যমে রোভার স্কাউটদের ঐসব ব্যবহারিক বিষয়ে বিশেষভাবে দক্ষ করে তোলা।

১। তাঁবু বাসের স্থান নির্বাচন ঃ নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধা যথাযথভাবে পাওয়া গেলে কোন স্থানকে তাঁবু বাসের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে।

(১) সহজ যাতায়াত ব্যবস্থা।
(২) খাবার পানির সহজলভ্যতা।
(৩) উঁচু, শুকনা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিচ্ছন্ন এলাকা।
(৪) দৈনন্দিন কাঁচাবাজার করার সুযোগ।
(৫) ডাক্তারের সহজলভ্যতা।
(৬) সম্ভব হলে ঘনগাছ গাছভার সবুজ পরিবেশ।

২। তাঁবু বাসের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত ও দলীয় উপকরণের তালিকা প্রণয়ন।

ব্যক্তিগত উপকরণঃ

(১) স্কাউট পোশাক।
(২) ব্যক্তিগত ব্যবহার্য কাপড়-চোপড়।
(৩) সময় উপযোগী বিছানা পত্র।
(৪) খাওয়ার প্লেট ও মগ বা গ্লাস।
(৫) সেভিং এর সরঞ্জাম।
(৬) আয়না ও চিরুনী।
(৭) জুতার ব্রাস ও কালি।
(৮) সুই-সুতা ও জামা, প্যান্টের অতিরিক্ত বোতাম।
(৯) টর্চ লাইট।
(১০) স্কাউট দড়ি।
(১১) চাকু বা ছুরি।
(১২) কলম ও কাগজ।
(১৩) স্কাউট লাঠি বা স্টাফ।

দলীয় উপকরণঃ

(১) উপদল ভিত্তিক রান্নার সরঞ্জাম (অন্ততঃপক্ষে তিনটি হাড়ি বা সসপেন

ঢাকনিসহ, চামচ ২টি, ফ্রাই প্যান ১টি)।

(২) উপদল ভিত্তিক তাঁবু ১টি করে।
(৩) উপদল ভিত্তিক বালতি ২টি করে।
(৪) উপদল ভিত্তিক জগ ১টি করে।
(৫) খাবার তেল সংরক্ষণ করার জন্য উপদল ভিত্তিক শিশি বা কৌটা ১টি করে।
(৬) লবণ ও বিভিন্ন মশলা রাখার জন্য উপদল ভিত্তিক প্রয়োজনীয় সংখ্যক কৌটা ১টি করে।
(৭) উপদল ভিত্তিক শাবল ১টি করে।
(৮) উপদল ভিত্তিক দা ১টি করে।
(৯) উপদল ভিত্তিক কোদাল ১টি করে।
(১০) উপদল ভিত্তিক কুড়াল ১টি করে।
(১১) দলীয় স্কাউট পতাকা।
(১২) দলীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য পতাকা দন্ড ও দড়ি।
(১৩) প্রশিক্ষণ উপকরণ (দড়ি, লাঠি, বাঁশ, কম্পাস ইত্যাদি)।

৩। **তাঁবু বাসের সাধারণ নিয়মাবলী জানা ঃ** তাঁবু বাসের সাধারণ নিয়মাবলী নিম্নে দেয়া হলঃ

(১) স্কাউট আইনই তাঁবু বাসের আইন।

(২) শিবির পরিচালকদের আহ্বানে দ্রুততা এবং চটপটতার সাথে সাড়া দিতে হবে।

(৩) নিজ নিজ শিবির এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব সেই উপদলকে বহন করতে হবে। সমগ্র শিবির এলাকা বিশেষ করে নিজ উপদল এলাকায় কোন ময়লা বা আবর্জনা জমা করে রাখা যাবে না।

(৪) ময়লা আবর্জনা ফেলার জন্য প্রত্যেক উপদলকে ২টি গর্ত তৈরি করে নিতে হবে। এই দুই গর্তে পোকামাকড় যাতে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য ঢাকনা দিয়ে সব সময় ঢেকে রাখতে হবে।

(৫) প্রত্যেক উপদলকে উপদল ভিত্তিক রান্না করে খেতে হবে।

(৬) তাঁবুর মধ্যে বসে খাওয়া দাওয়া নিষিদ্ধ।

(৭) বিশেষ প্রয়োজনে একমাত্র রোভার মেট ছাড়া অন্য কোন রোভার স্কাউট ক্যাম্প পরিচালক মন্ডলীদের এলাকায় যেতে পারবে না।

(৮) ক্যাম্প চলাকালীন কেহ নিজের ইচ্ছামত ক্যাম্প এলাকা ত্যাগ করে বাইরে যেতে পারবে না। বিশেষ প্রয়োজনে কারো যদি ক্যাম্প এলাকার বাইরে যেতে হয় তাহলে সে প্রথমে নিজে রোভার মেটকে তার প্রয়োজনের কথা বলবে। রোভার মেট যদি মনে করে যে তার ক্যাম্প এলাকার বাইরে যাওয়ার একান্ত প্রয়োজন তা হলে রোভার মেট সিনিয়র রোভার মেটকে জানাবে। সিনিয়র রোভার মেট রোভার স্কাউট লিডারকে বলে তার বাইরে যাওয়ার জন্য লিখিত অনুমতি সংগ্রহ করবে এবং তা ক্যাম্প চিফ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্যাম্প পরিচালকমন্ডলীর সদস্যকে দেখিয়ে ঐ অনুমতি পত্রে তার স্বাক্ষর গ্রহণ করবে। এরপর সে তার সদস্যকে ক্যাম্প এলাকার বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেবে।

(৯) ক্যাম্প চলাকালীন প্রতিটি সেশনে পরিপাটি স্কাউট পোশাক পরে এবং খাতা কলমসহ সময়মত উপস্থিত থাকতে হবে।

(১০) প্রতিবারে ব্যবহারের পরে থালাবাটি, বাসন- কোসন, হাঁড়ি-পাতিল ইত্যাদি ধুয়ে মুছে নির্ধারিত গ্যাজেটে সাজিয়ে রাখতে হবে। হাঁড়ি পাতিল ধোয়ার পর হাঁড়ি-পাতিলের তলায় মাটির প্রলেপ দিতে হবে।

(১১) সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর বিছানাপত্র এবং ব্যবহার্য পোশাক-পরিচ্ছদ, হারিকেন ইত্যাদি তাঁবুর বাইরে (রোদে) পরিপাটি ভাজ করে গ্যাজেটে সাজিয়ে রাখতে হবে এবং সন্ধ্যার পূর্বে তাঁবুর মধ্যে রাখতে হবে।

(১২) সন্ধ্যায় তাঁবুর রশি হালকা ও সকালে তাঁবুর রশি শক্ত করে বাঁধতে হবে।

(১৩) তাঁবুর ফ্লাপগুলি পতন স্থানের বরাবর ৮ সে.মি. গভীর নালা কেটে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(১৪) প্রতিবার রান্নার পর চুলার আগুন সম্পূর্ণ নিভিয়ে ফেলতে হবে।

(ঙ) তাঁবু খাটানো, গোটানো ও তাঁবুর যত্নঃ নিম্নে তাঁবু খাটানো, তাঁবু গোটানো ও তাঁবুর যত্ন নেয়া সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

৪। **তাঁবু খাটানো, গোটানো ও যত্ন নিতে পারা ঃ** তাঁবু খাটানোর জন্য তাঁবুর মাঝখানে প্রথম বারগুলি যথাযথভাবে স্থাপন করতে হবে। বারগুলি স্থাপন করার সময় তাঁবুর মাঝখানের দু'টি বারের হুকগুলি যেন পরস্পরের উপরে এবং নিচে থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। বার স্থাপন করা শেষ হলে তাঁবুর পোল তিনটির

অগ্রভাগের শিকগুলোকে বারের হুকের মধ্যে দিয়ে তাঁবুর নির্দিষ্ট ফাঁকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। এভাবে বার এবং পোল স্থাপন করা হলে পোল তিনটিকে একই সমান্তরাল রেখায় রেখে প্রথমে চার কোণায় চারটি পেগ পুতে ঐ পেগের সাথে তাঁবুর গাই লাইনগুলি বেঁধে ফেলতে হবে। এভাবে স্থাপন করা হলে তাঁবু মোটামুটিভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। এবার তাঁবুর অন্যান্য গাই লাইনের সমান্তরালে অন্যান্য পেগ পুঁতে ঐ গাই লাইনগুলি পেগের সাথে বেঁধে দিতে হবে। এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রতিটি পেগ একই সমান্তরাল রেখায় অবস্থান করে। তাঁবুর সামনে ও পেছনে যে লম্বা দড়ি থাকে তাকে গাই রোপ বলে। এবার ঐ গাই রোপ দু'টিকে তাঁবুর পোলের বরাবর তাঁবুর সামনে ও পেছনে পেগস পুঁতে এ পেগের সাথে বেঁধে দিতে হবে। এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে গাই রোপে পেগ যেন তাঁবুর দুই কোণের দু'টি পেগ থেকে সমান দূরত্বে থাকে। এভাবে তাঁবু খাটালে যথাযথভাবে যথাস্থানে তাঁবু সবসময় অবস্থান করবে এবং অল্প ঝড়ে তাঁবু পড়ে যাবে না।

তাঁবু গোটানোঃ তাঁবু গোটানোর জন্য প্রথমে তিনজনকে তাঁবুর তিনটি পোল ধরতে হবে। অন্যজন তাঁবুর সব গাই লাইন এবং গাই রোপ খুলে দেবে। গাই লাইন এবং গাই রোপ খোলা শেষ হলে যারা তাঁবুর পোল ধরে আছে, তারা আস্তে আস্তে পোল তিনটিকে বাঁকা করে তাঁবুকে মাটিতে ফেলবে। তাঁবু মাটিতে পড়ার পর তাঁবুর মধ্য থেকে তাঁবুর পোল এবং বার বের করে নিতে হবে। এবার তাঁবুর উপরের অংশকে মাটিতে রেখে তাঁবুকে সম্পূর্ণ বিছিয়ে দিতে হবে। এভাবে তাঁবু বিছানো হলে তাঁবুর পাশের ফ্ল্যাপ এবং তাঁবুর মুখের ফ্ল্যাপগুলো পুরোপুরিভাবে এবং ১টি গাই রোপ ছাড়া অন্য গাই রোপ ও গাই লাইনগুলো টেনে তাঁবুর উপরে রাখতে হবে। এভাবে রাখার পর এক প্রান্তকে লম্বালম্বি ভাবে টেনে অপর প্রান্তের উপর রাখতে হবে। এই ভাবে রাখার পর তাঁবুটি অর্ধেক ভাঁজ হবে। এবার এই অর্ধেক ভাঁজ করা তাঁবুকে আবার একবার ভাঁজ করতে হবে। এবার এই ভাঁজ করা তাঁবুকে লম্বালম্বিভাবে রেখে তিন ভাজ করতে হবে। এভাবে ভাঁজ করা হয়ে গেলে যে গাই রোপ তাঁবুর বাইরে রাখা হয়েছিল সেটি লম্বালম্বিভাবে মাটিতে বিছিয়ে দিতে হবে। এরপর লম্বালম্বি করে ভাঁজ করে গাই রোপ দিয়ে তাঁবুকে ভালভাবে শক্ত করে বাঁধতে হবে, এভাবে তাঁবু গোটাতে হয়।

তাঁবুর যত্নঃ তাঁবু অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। যথাযথ যত্ন না নিলে এই সম্পদ তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সে জন্য সকলকে তাঁবুর যত্ন কিভাবে নিতে হয় তা জানা প্রয়োজন।

তাঁবু খাটানোর পর বৃষ্টি শুরু হলে অথবা শীতকালে সন্ধ্যায় তাঁবুর গাই লাইন এবং

গাই রোপগুলো আলগা করে দিতে হবে। কারণ পানিতে বা শিশিরে দড়ি ভিজে সংকুচিত হয়ে যায়। দড়ি সংকুচিত হয়ে গেলে, তা যদি টান টান করে বাঁধা থাকে তাহলে ঐ দড়ি ছিঁড়ে যেতে পারে। এই জন্য শীতের দিন সন্ধ্যায় এবং বৃষ্টির সময় গাই লাইন এবং গাই রোপ ঢিলা করে দিতে হয়। শীতকালের সকালে আবার গাই লাইন এবং গাই রোপ টাইট করে নিতে হবে। তেমনি বৃষ্টির পর দড়ি শুকিয়ে গেলে দড়ি আবার টাইট করে দিতে হবে। তাঁবুতে কোন ময়লা বা কাদা লেগে গেলে তা সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার করে দিতে হবে। প্রতিবার ব্যবহারের পরে তাঁবু ভালভাবে রোদে শুকিয়ে রাখতে হবে। তাঁবু মাটিতে না রেখে উঁচু মাচায় রাখা ভাল। এতে তাঁবু নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে। মাচা পাওয়া না গেলে কোন শুকনা তক্তার উপর তাঁবু রাখা উচিত। লক্ষ্য রাখতে হবে মাচায় বা তক্তায় তাঁবু রাখার পর তাঁবুর কোন অংশ যেন দেয়ালে বা মাটিতে স্পর্শ না করে।

THE TENT

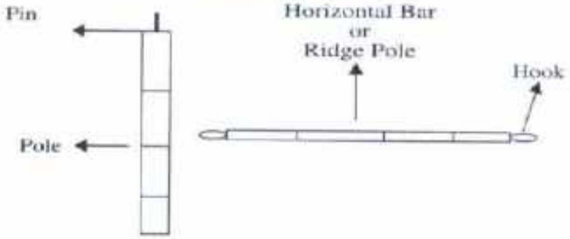

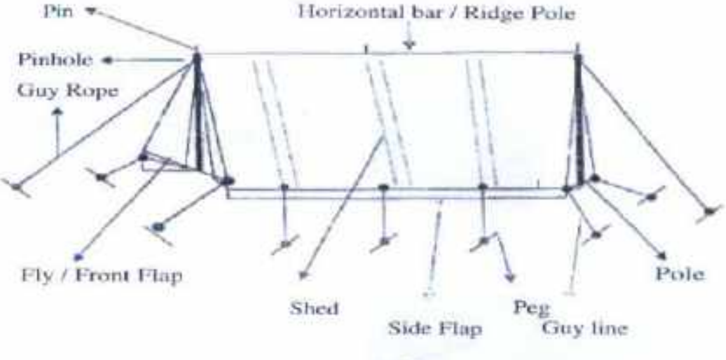

৫। তাঁবু বাসের জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাজেট তৈরি করতে পারা ঃ তাঁবু বাসের সময় প্রয়োজনীয় বিছানা রাখার গ্যাজেট, প্লেট রাখার গ্যাজেট এবং হ্যাংগার তৈরি করতে হয় সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। এখানে আরো কিছু প্রয়োজনীয় গ্যাজেট কিভাবে তৈরি করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে বলা হলো।

জুতা রাখার র‍্যাকঃ একই ডালের দু'টি শাখা বিশিষ্ট এমন চারটি গাছের ডাল সংগ্রহ করতে হবে। এই ধরণের চারটি ডাল সংগ্রহ করে দু'টি ডালকে অপর দু'টি ডালের মূল অংশ থেকে ৫-৮ সে.মি ছোট করে কাটতে হবে। এবার বড় দু'টি ডালকে পাশাপাশি এক মিটার দূরে দূরে মাটিতে পুতে দিতে হবে। এবার অপর দু'টি ডালকে আগের পোতা ডালের ১২-১৫ সে.মি পেছনে প্রশাখা বিশিষ্ট অংশকে উপরের দিকে রেখে মাটিতে পুততে হবে। এবারে চারটি ডাল পোতা হলে সামনের ও পেছনের পোতা ডালের 'ভি' আকৃতির অংশে অপর একটি সরু বাঁশ স্থাপন করতে হবে। এখানে কোন বাঁধন দিতে হবে না। এভাবে ঐ মাটিতে পোতা চারটি ডালের উপর দু'টি সরু বাঁশ স্থাপন করা হলে তা জুতা রাখার র‍্যাক হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। জুতা রাখার র‍্যাকের একটি ছবি দেয়া হল। এই ছবি থেকে জুতা রাখার র‍্যাক তৈরির বিষয়ে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে।

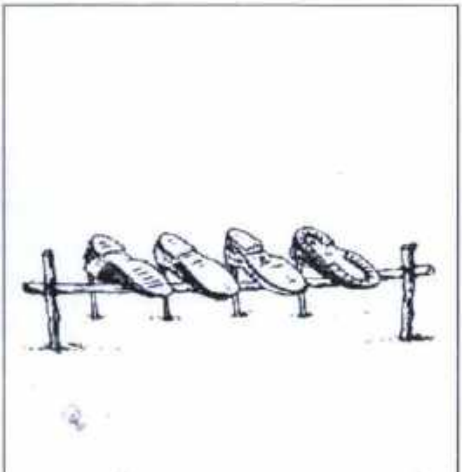

বালতি রাখার র‍্যাকঃ শক্ত গাছের ডালের যে অংশের শেষ প্রান্তে দু'টি প্রশাখা শুরু হয়েছে তেমনি ধরনের ৭০-৮০ সে.মি. লম্বা দু'টি গাছের ডাল সংগ্রহ করতে হবে। এ ধরনের গাছের ডাল সংগ্রহ করে প্রশাখার অতিরিক্ত অংশ কেটে ঐ ডাল দু'টিকে পরস্পরের এক মিটার দূরে প্রশাখা বিশিষ্ট অংশকে উপরে রেখে মাটিতে পুতে দিতে হবে। এভাবে মাটিতে ডাল পোতার পর প্রশাখা যেখানে শুরু হয়েছে সেই 'ভি' আকৃতি অংশে একটি শক্ত বাঁশ স্থাপন করতে হবে। ঐ বাঁশের মধ্যে বালতির

হ্যান্ডেল ঢুকিয়ে বালতি বা জগ রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বালতি রাখার র‍্যাকের একটি ছবি দেয়া হল। এই ছবি দেখে এই র‍্যাক তৈরি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে।

বালতি রাখার র‍্যাক

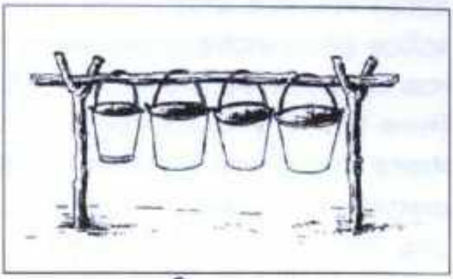

বালতি রাখার র‍্যাক

এমনি ধরনের নানাবিধ ছোট ছোট জিনিস দিয়ে তাঁবু বাস চলাকালীন প্রয়োজনীয় প্রচুর গ্যাজেট তৈরি করে নেয়া যেতে পারে।

৬। **ক্যাম্প ল্যাট্রিন তৈরি করতে পারা ঃ** তাঁবু বাস চলাকালীন স্কাউটরা ট্রেঞ্চ টাইপ ল্যাট্রিন ব্যবহার করে থাকে। ট্রেঞ্চ টাইপ ল্যাট্রিনের গর্ত কতটুকু হবে তা এবং ল্যাট্রিনের সংখ্যা নির্ভর করবে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যার উপর।

ট্রেঞ্চ টাইপ ল্যাট্রিন তৈরি করার জন্য ৩০-৪০ সে.মি. মাটিকে লম্বালম্বি ভাবে অন্ততঃপক্ষে ৭০-৯০ সে.মি. গর্ত করতে হবে। গর্ত করার ফলে যে মাটি পাওয়া যাবে তা ট্রেঞ্চ এর পাশে উঠিয়ে রাখতে হবে। প্রতিবার পায়খানা করার পর ঐ মাটি পায়খানার উপর ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে মশা মাছি বা অন্য কোন পোকামাকড় ঐ পায়খানার উপর বসে জীবাণু বহন করতে না পারে। মাটি খোড়া হয়ে গেলে ল্যাট্রিনের পেছনের অংশকে বেড়া বা চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এবার গর্তের প্রতি এক মিটার অন্তর অন্তর বেড়া বা চট দিয়ে পায়খানাকে পৃথক করতে হবে। এভাবে প্রত্যেক পায়খানাকে পৃথক করা হয়ে গেলে প্রত্যেক পায়খানার গর্তের দুপাশে ৩০-৩৫ সে.মি দূরে দূরে পা রাখার জন্য শক্ত তক্তা বা মোটা বাঁশ মাঝখানে চিরে স্থাপন করতে হবে। এরপর প্রতি পায়খানার জন্য বেড়া বা চট দিয়ে পায়খানার দরজা দিতে হবে। এভাবে ক্যাম্প ল্যাট্রিন তৈরি করতে হয়। তবে স্যানিটারী ল্যাট্রিন তৈরি অধিক স্বাস্থ্যসম্মত।

৭। **বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্প কিচেন তৈরি করতে পারা এবং হাড়ি পাতিল ও খাবারের যত্ন নিতে পারা ঃ** ক্যাম্পে রান্নার জন্য বিভিন্ন ধরনের চুলা তৈরি করে ব্যবহার করা যেতে পারে। নিম্নে ক্যাম্পে ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন চুলার বর্ণনা দেয়া হলো।

তারকা খচিত চুলাঃ যে গাছের ডালের প্রান্তে দু'টি প্রশাখা শুরু হয়েছে তেমনি ধরনের এক মিটার লম্বা দু'টি গাছের ডাল সংগ্রহ করে প্রশাখার অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলতে হবে। এবার ঐ দু'টি গাছের ডালকে পরস্পর থেকে এক মিটার দূরে মাটিতে গর্ত করে প্রশাখা বিশিষ্ট অংশকে উপরে রেখে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। মাটিতে পোঁতা ডালের যেখানে প্রশাখা শুরু হয়েছে সেই 'ভি' আকৃতি স্থানে একটি শক্ত বাঁশ স্থাপন করতে হবে। এভাবে রাখা বাঁশের সাথে শক্ত দড়ি দিয়ে বা লোহার শিকল দিয়ে হাঁড়ি বাঁধতে হবে অথবা হাঁড়ির সাথে যে লম্বা আংটা আছে সেটি ঐ বাঁশের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। এবার ঐ হাড়ির নিচে আগুন জ্বালাতে হবে। এভাবে আগুন জ্বালালে ঐ আগুনের তাপে হাড়ির মধ্যকার ভাত বা তরিতরকারি সেদ্ধ হয়ে যাবে। এভাবে তৈরি চুলাকে তারকা খচিত চুলা বলে। দেয়া চিত্র দেখে তারকা খচিত চুলা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

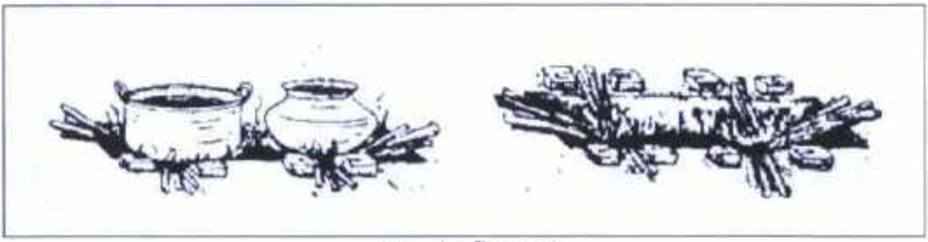

তারকা খচিত চুলা

ট্রেঞ্চ টাইপ চুলাঃ ট্রেঞ্চ টাইপ চুলা তৈরি করার জন্য ৪০-৫০ সে.মি লম্বা এবং ১৫ সে.মি প্রশস্ত বিশিষ্ট স্থানকে ১৫-২০ সে.মি খুঁড়তে হবে। এভাবে খোঁড়া হলে ঐ খোড়া স্থানের দুপাশে একটির উপর অপর একটি ইট বা পাথর দিয়ে স্থাপনাকে উঁচু করতে হবে। ঐ ইট বা পাথরের উপরে হাড়ি বসাতে হবে। এভাবে হাড়ি বসিয়ে ঐ গর্তের মধ্যে কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালাতে হবে। এভাবে ট্রেঞ্চ টাইপ চুলা তৈরি করতে হবে। দেয়া চিত্র দেখে ট্রেঞ্চ টাইপ চুলা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

ধোঁয়াবিহীন মাগন চুলা ঃ নিজের প্রয়োজন মত চারিদিকে অন্ততঃপক্ষে ১৫ সে.মি উঁচু এবং ৩-৫ সে.মি চওড়া মাটির দেয়াল তৈরি করতে হবে। অপর এক জায়গায় কোন কাঠের তক্তার উপর আগে তৈরি মাটির দেয়ালের সমপরিমাণ ৩-৫ সে.মি

চওড়া মাটির স্লাপ তৈরি করতে হবে। মাটির দেয়াল এবং মাটির স্লাপ একটু শুকালে ঐ মাটির স্লাপকে ঐ দেয়ালের উপর রাখতে হবে। এবার দেয়ালের সাথে উপরের মাটির স্লাপকে কাদা দিয়ে প্রলেপ দিয়ে মিশিয়ে দিতে হবে। এবার ঐ দেয়ালের উপরে রাখার মাটির স্লাপকে হাড়ির নিচের অংশের সমান করে দু'টি বা তিনটি অংশে গর্ত করে মাটি ফেলে দিতে হবে। ঐ জায়গায় রান্নার জন্য হাড়ি বসাতে হবে। দেয়ালের উপর রাখা মাটির স্লাপের এক কোণে সামান্য গর্ত করে মাটি ফেলে দিতে হবে। এই অংশে ধোঁয়া বের হওয়ার জ্য পাইপ স্থাপন করতে হবে। এবারে যেদিকে চুলার মুখ রাখা হবে সে অংশের কিছু মাটি কেটে ফেলতে হবে। এই অংশ দিয়ে চুলায় কাঠ দিতে হবে। এভাবে ধোঁয়াবিহীন মাগন চুলা তৈরি করা যেতে পারে। ধোঁয়াবিহীন মাগন চুলা ব্যবহারের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) চুলায় কোন ধোঁয়া হয় না।

(খ) তাপের অপচয় হয় না। চুলায় দাহ্য বস্থু দিয়ে তৈরি তাপ পুরোপুরি কাজে লাগে।

হাড়ি-পাতিলের যত্নঃ হাড়ি-পাতিলে খাবার রান্না করা হয়। স্বাস্থ্য রক্ষার স্বার্থে যথাযথভাবে হাড়ি-পাতিলের যত্ন নেয়া সকলের উচিত। হাড়ি-পাতিল সব সময় ভালভাবে ধুয়ে ব্যবহার করা প্রয়োজন। তাঁবু বাসে স্কাউটরা কাঠের চুলা ব্যবহার করে। কাঠের চুলা ব্যবহার করার ফলে প্রচুর ধোঁয়া হয় আর এই ধোঁয়া হাড়ি-পাতিলের গায়ে লেগে হাড়ি পাতিলকে কালো করে ফেলে। এই কালি যথাযথ সময়ে না পরিষ্কার করলে কিছুদিন ব্যবহারের পরে এই হাড়ি-পাতিল দেখতে অত্যন্ত বিশ্রী হয়ে পড়ে। হাড়ি-পাতিল ধোঁয়ার সময় স্কাউটরা হাড়ি-পাতিলের বাইরের অংশ গাঢ় করে মাটির প্রলেপ দেয়। মাটির প্রলেপ দেয়ার পর ঐ হাড়ি পাতিলকে রোদে শুকানো হয়। এরপর ঐ হাড়ি-পাতিল রান্নার জন্য ব্যবহার করা হয়। হাড়ি-পাতিলের বাইরের অংশে মাটির প্রলেপ দেয়া রান্নার সময় ধোঁয়া ঐ মাটির উপর লাগে, মূল হাড়ি পাতিলের গায়ে লাগে না। ধোঁয়ার সময় ঘষা দিলে ঐ ধোঁয়া যুক্ত মাটির প্রলেপ উঠে যায়।

বন্ধু চুলা বা উন্নত চুলা ঃ

ভূমিকাঃ বাংলাদেশের প্রায় তিনকোটি পরিবারের আধিকাংশকেই জৈব জ্বালানী যেমন-কাঠ, খড়-কুটা, গোবর ইত্যাদির উপর নির্ভর করতে হয়। মাত্র ৬-৭% পরিবার গ্যাসের সুবিধা পাচ্ছে। এই ভাবে গ্রামের সব পরিবার এবং শহর অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক পরিবার জৈব জ্বালানী দিয়ে রান্না করে থাকে এবং এজন্য এদেশে

বছরে ১৫০ কোটি মন জ্বালানী ব্যবহৃত হচ্ছে। জৈব জ্বালানী ব্যবহারের সাথে বন ধ্বংস,পরিবেশ দূষণ, কঠিন কায়িক প্ররিশ্রম স্বাস্থ্যহানীর সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের জৈব জ্বালানীর ব্যবহার ইতিমধ্যে প্রাকৃতিক নবায়নের সীমা অতিক্রম করেছে এবং অনেক জায়গায়ই জৈব জ্বালানীর স্বল্পতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

প্রচলিত চুলা ঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় নানারকম চুলা প্রচলিত আছে। এসব চুলায় সাধারনতঃ ৩টি ঝিকা থাকে এবং চুলার গভীরতা ৩০-৪০ সেঃমিঃ হয়ে থাকে। ধোঁয়া রান্না ঘরের মধ্যেই ছড়িয়ে থাকে। এই সব চুলার জ্বালানি ক্ষমতা মাত্র ১০%-১৫% অর্থাৎ জ্বালানি পুড়িয়ে যতটুকু তাপশক্তি পাওয়া যায়, তার অল্পই কাজে লাগে। এজন্য প্রচলিত চুলায় জ্বালানি খরচ বেশি, রান্না হতে বেশি সময় লাগে, রান্নাঘরে ধোঁয়া, কালি ও ঝুল হয় এবং হাড়িপাতিল বেশি ময়লা হয়। সর্বোপরি চুলা ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্যহানি ঘটে এবং রান্নাঘরের পরিবেশ দূষিত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী আমাদের দেশে প্রতি বছর ৩২ হাজার শিশু ও ১৪ হাজার মহিলা শুধু রান্নাঘরের ধোঁয়াজনিত রোগের কারণে মারা যায়। এছাড়া প্রচলিত চুলা ব্যবহারের সময় অগ্নিজনিত দুর্ঘটনাও বেশি ঘটে। উপরন্ত বেশি জ্বালানি ব্যবহারের কারণে ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে বৃক্ষনিধন দিন দিন বাড়ছে। ফলে যেমন বন উজাড় হচ্ছে, তেমনি পরিবেশ ভারসাম্য হারাচ্ছে ।

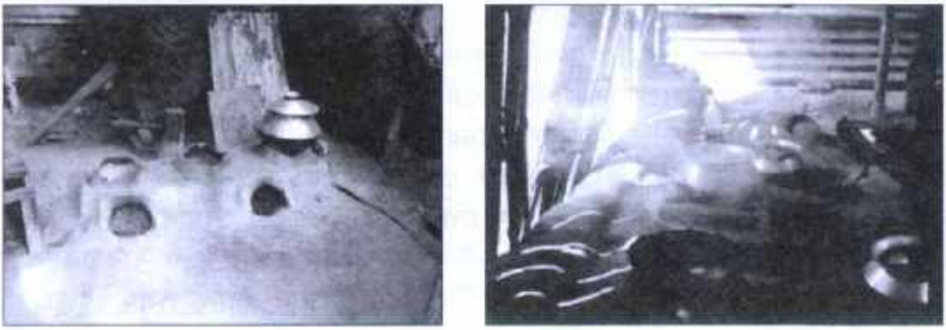

ছবি-১ ঃ প্রচলিত চুলা

জ্বালানির অপচয়রোধ, রান্নাঘর ধোঁয়া ও দূষণমুক্ত রাখতে এবং ব্যবহারকারীর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ ১৯৮০-র দশকে চুলা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং বিভিন্ন মডেলের উন্নত চুলা উদ্ভাবন করেন। এবং তারা সীমিত আকারে উন্নত চুলার সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। দুঃখজনকভাবে ১৯৯০-র দশকে এই কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন পর ২০০৬ সালে জার্মান টেকনিক্যাল কো-অপারেশন (জিআইজেড) বাংলাদেশ

সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয়ের (বিদ্যুৎ বিভাগ)। সাথে যৌথভাবে উন্নত চুলা কার্যক্রম হাতে নেয়। চুলাকে আরও কার্যকর এবং সহজ ব্যবহারযোগ্য করে সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বত্র পৌছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। চুলার সার্বিক দিক বিবেচনা করে জিআইজেড শুধুমাত্র চিমনি যুক্ত চুলা সম্প্রসারণ করতে থাকে। চুলার স্থায়িত্ব ও বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান সহজ করার লক্ষ্যে জিআইজেড সীমিত আকারে গবেষনার মাধ্যমে কংক্রীট ও পোড়ামাটির চুলা উদ্ভাবন করে। চুলার উচ্চ মান ও বিক্রয়োত্তর সেবা নিশ্চিত করার জন্য এই চুলাকে "বন্ধু চুলা" নামে অভিহিত করা হচ্ছে।

বন্ধু চুলা কি?

"বন্ধু চুলা" একটি উন্নত চুলা। এটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে এবং সহজলভ্য উপকরণে তৈরী। ছাঁকনি, চিমনি এবং টুপি এই চুলার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ছাঁকনির উপর জ্বালানি পোড়ানো হয়। ধোঁয়া চিমনি দিয়ে ঘরের বাইরে চলে যায়। বন্ধু চুলায় কোনো ঝিকা না থাকায় আগুনের তাপ বেশি কাজে লাগে। বন্ধু চুলার জ্বালানি দক্ষতা ২৭%-২৯% অর্থাৎ এই চুলা ব্যবহারে প্রচলিত চুলার তুলনায় অর্ধেক জ্বালানি সাশ্রয় হয়, রান্নাঘর ধোঁয়া ও দূষণমুক্ত থাকে, চোখ জ্বালা, হাঁপানি, মাথাব্যথা ও ক্যান্সারের মত রোগের ঝুঁকি কমে যায়, রান্নাঘর পরিচ্ছন্ন, কালি ও ঝুলমুক্ত থাকে, অগ্নিজনিত দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কমে যায়, গ্রীণ হাউজ ইফেক্ট কমাতে (একটি বন্ধু চুলা ব্যবহারে বৎসরে ১.৭ টন কার্বনডাই অক্সাইড কম নির্গমন হয়) সাহায্য করে।

বন্ধু চুলার প্রকারভেদ ঃ

বন্ধু চুলা একমুখী, দুইমুখী অথবা তিনমুখী হয়ে থাকে। গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী বন্ধু চুলা সম্পূর্ণ বা অর্ধেক মাটির উপরে বানানো যেতে পারে। শুরুতে মাটির তৈরী হলেও বর্তমানে বন্ধু চুলা শুধুমাত্র কংক্রীট দিয়ে তৈরি করা হয়।

এক মুখী বন্ধু চুলাঃ

একটি চুলা মুখের সাথে একটি জ্বালানী পথ থাকে। এই চুলার জ্বালানী দক্ষতা ২৬%-২৭% এবং সনাতন চুলার তুলনায় ৪৫%-৫০% জ্বালানী সাশ্রয় হয়।

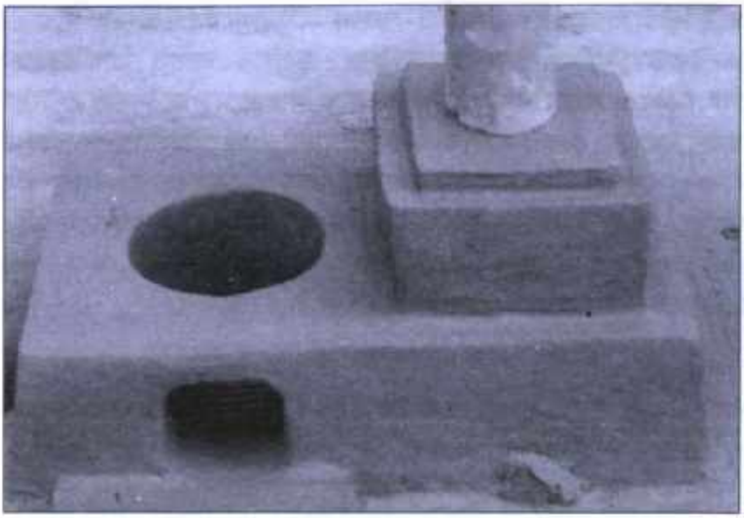

ছবি-২ ঃ এক মুখী বন্ধ চুলা

জোড়া চুলা - দুইটি জ্বালানী পথ বিশিষ্ট দুই মুখী বন্ধ চুলাঃ

এই চুলায় দুইটি জ্বালানী পথ ও দুইটি চুলা মুখ থাকে। এটি আসলে একমুখী বন্ধ চুলার জোড়া সংস্করণ যাতে একটি চিমনী থাকে। প্রয়োজন অনুযায়ী একটি অথবা উভয় চুলা এক সাথে ব্যবহার করা যায়। এই চুলার জ্বালানী দক্ষতা ২৬%-২৭% এবং সনাতন চুলার তুলনায় ৪৫%-৫০% জ্বালানী সাশ্রয় হয়।

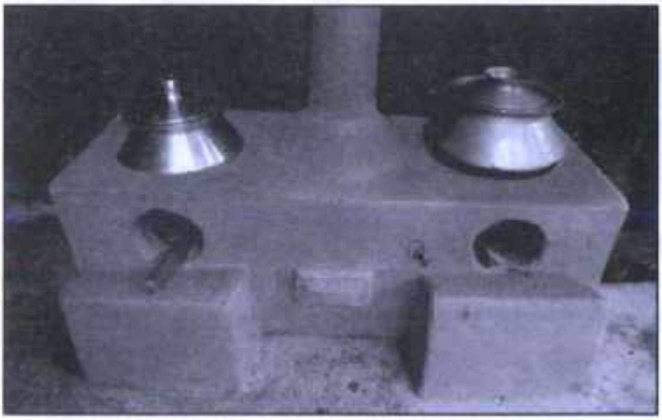

ছবি-৩ ঃ জোড়া চুলা (দুইটি জ্বালানী পথ বিশিষ্ট দুই মুখী)

একটি জ্বালানী পথ বিশিষ্ট দুই মুখী বন্ধ চুলা ঃ

এই চুলায় একটি জ্বালানী পথ ও দুইটি চুলা মুখ থাকে। এখানে একই সাথে উভয় চুলাই ব্যবহার করতে হয়। তাত্ত্বিকভাবে এই চুলার জ্বালানী দক্ষতা ২৮%-২৯%

এবং সনাতন চুলার তুলনায় ৫০%-৫৫% জ্বালানী সাশ্রয় হয় এবং রান্না করতে সময় একটু বেশী লাগে। কিন্তু যদি একটি মুখ ব্যবহার হয় এবং অন্যটি অব্যবহৃত থাকে তাহলে এতে কোন জ্বালানী হয় না; বরং জ্বালানী বেশী লাগতে পারে।

ছবি-৪ ঃ একটি জ্বালানী পথ বিশিষ্ট দুই মুখী বন্ধু চুলা

বাংলাদেশের রাধুনীরা অভ্যাসগত ভাবে একটি চুলা ব্যবহার করে থাকে এবং কদাচিত দুটি চুলায় এক সাথে রান্না করে দুই জ্বালানী পথ বিশিষ্ট দুই মুখী চুলা অর্থাৎ জোড়া চুলা বেশী জ্বালানী সাশ্রয়ী ও রাধুনীর বেশী পছন্দ বলে প্রমাণিত হয়েছে। যদিও এই চুলা বানাতে খরচ একটু বেশী হয়।

তিন মুখী বন্ধু চুলা ঃ

একটি একমুখী ও একটি দুই মুখী চুলার সমন্বয়ে তৈরী তিনমুখী বন্ধু চুলা। এতে দুইটি জ্বালানী পথ ও একটি চিমনী থাকে। ইচ্ছা করলে রাধুনী একটি, দুইটি অথবা তিনটি মুখই এক সাথে ব্যবহার করতে পারেন। বড় পরিবারের জন্য এই চুলা খুবই উপযোগী।

ছবি-৫ ঃ তিন মুখী বন্ধু চুলা

বন্ধু চুলার ব্যবহার ঃ

পারিবারিক রান্নার কাজে বন্ধু চুলা বহুল ব্যবহৃত। ছাত্রাবাস, হাসপাতাল, সেনানিবাস, পুলিশ ফাঁড়ি প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান বন্ধু চুলা ব্যবহার করে জ্বালানি খরচ অর্ধেকে কমিয়ে এনেছে। রেস্তোরা, চায়ের দোকান প্রভৃতি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বন্ধু চুলা ব্যবহৃত হচ্ছে। শিল্প কারখানাতেও সফলভাবে বন্ধু চুলা ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ব্যবসায়িক মুনাফা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। মোট কথা যেখানে শুকনা কাঠ, খড় ইত্যাদি জ্বালানি ব্যবহৃত হয় সেখানেই বন্ধু চুলা উপযোগী।

ছবি-৬ ঃ প্রাতিষ্ঠানিক বন্ধু চুলা

ছবি-৭ ঃ বাণিজ্যিক বন্ধু চুলা

জিআইজেডের সহায়তা ঃ

জিআইজেড বন্ধু চুলার কার্যক্রমকে টেকসই করার লক্ষ্যে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই জন্য জিআইজেড সারা বাংলাদেশে বন্ধু চুলা নির্মাণকারী সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তা তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তারা বাণিজ্যিকভাবে বন্ধু চুলা নির্মাণ, স্থাপন ও বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করে থাকে। জিআইজেড সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তাদের এই প্রচেষ্টায় যাবতীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। এযাবত জিআইজেড ১০,০০০ (দশ হাজার) এর বেশি যুব মহিলা ও যুব পুরুষকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বন্ধু চুলার দক্ষ কারিগর হিসাবে গড়ে তুলেছেন। বর্তমানে ২০০০ এর বেশী কারিগর বন্ধু চুলা তৈরি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছেন।

বন্ধু চুলা সম্প্রসারণ ঃ

জিআইজেড বাংলাদেশে সমস্ত উন্নত চুলার কার্যক্রমকে সমন্বিত করার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশে যারা বর্তমানে উন্নত চুলা সম্প্রসারণ করছে সবাই কোন না কোন ভাবে জিআইজেড এর সাথে সম্পর্কিত। বর্তমানে ২৫০টি বেশী সংগঠন বন্ধু চুলা সম্প্রসারণের কাজে নিয়োজিত। এরা দেশের সর্বত্র কাজ করছে। এযাবত প্রায় ৪

লক্ষ বন্ধু চুলা স্থাপিত হয়েছে এবং সেগুলি প্রতিদিন ব্যবহার হচ্ছে। জিআইজেডের সহযোগী সংস্থার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, মানুষেরও চুলার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তারা টাকার বিনিময়ে চুলা কিনতে আগ্রহী হচ্ছেন। এভাবে চুলা স্থাপনের গতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে মাসে ২০,০০০ বন্ধু চুলা তৈরি হচ্ছে।

বন্ধু চুলার কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে জিআইজেড দেশের সমস্ত সেনেটারী দোকান ও রাজমিস্ত্রীদের এই কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উদ্দেশ্যে দেশের সকল উপজেলার সেনেটারী দোকান ও রাজমিস্ত্রীদের উদ্বুদ্ধ করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে যে, এদের অনেকেই বন্ধু চুলা বানানো ও স্থাপনকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করবে।

জিআইজেডের উদ্দেশ্য ঃ

জিআইজেডের উদ্দেশ্য বাংলাদেশের প্রতিটি সাধারণ প্রচলিত চুলাকে বন্ধু চুলা দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা। এই উদ্দেশ্যে জিআইজেড সকলের সাথে সহযোগিতা করতে আগ্রহী। বাংলাদেশে প্রতি বাড়িতে বন্ধু চুলা স্থাপন করতে পারলে জাতীয় ভাবে নিম্নলিখিত অর্জন সম্ভব ঃ

- ধোঁয়া জনিত রোগে প্রতি বছর যে ৪৬,০০০ মানুষ মারা যায় তাদের বাঁচানো সম্ভব।
- লক্ষ লক্ষ মানুষ মাথা ব্যথা, হাপানি, শ্বাসকষ্ট, চোখের রোগ ইত্যাদির যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পাবে। তাদের ঔষধের খরচ বেঁচে যাবে।
- জ্বালানি খরচ অর্ধেক বেঁচে যাওয়ার কারণে ৭০ কোটি মন লাকরি বেঁচে যাবে। তাতে বাংলাদেশের বন আবার গাছ-গাছালিতে ভরে উঠবে এবং বাংলাদেশের সার্বিক পরিবেশের উন্নতি ঘটবে।
- বৎসরে প্রায় ৫ কোটি টন কম কার্বনডাই অক্সাইড নির্গমন করে বিশ্ব পরিবেশের বিপর্যয় ঠেকাতে ভূমিকা রাখবে।

প্রতিবন্ধকতা ঃ

বন্ধু চুলা সম্প্রসারণ করতে গিয়ে নিম্নলিখিত প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে ঃ

- গৃহিনীর চিরাচরিত অভ্যাস পরিবর্তনের অনিহা।
- অনেক রাধুনী ধোঁয়া যে স্বাস্থ্যহানি ঘটায় সে সম্পর্কে অবহিত নয়।
- প্রচলিত চুলা রাধুনীরা নিজেরাই তৈরি করে থাকে বলে তাদের কোন অর্থ ব্যয় হয় না। তাই চুলার জন্য অর্থ ব্যয় করতে তারা তেমন উৎসাহিত নয়।

- যারা টাকা দিয়ে জ্বালানী ক্রয় করে না তারা জ্বালানী সাশ্রয়ের বিষয়টি তেমন গুরুত্ব দেয় না।
- বন্ধু চুলার উচ্চ মান ও রক্ষনাবেক্ষন সেবা নিশ্চিত করতে না পারার কারণে অতীতে উন্নত চুলা সম্পর্কে অনেক ব্যবহারকারীর ধারণা খুব ভাল না হওয়ায় তারা নতুন করে বন্ধু চুলা কিনতে কম আগ্রহী।

খাবারের যত্নঃ স্বাস্থ্যের জন্য সব সময় খাবারের যথাযথ যত্ন নিতে হয়। খাবার রান্নার পর সব সময় ঢেকে রাখতে হবে। কোন অবস্থাতেই রান্নার পর খাবার অঢাকা অবস্থায় রাখা যাবে না। খাবার ঢেকে না রাখলে বাইরের ময়লা পড়ে খাবার নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৮। উপদলের সদস্যদের জন্য বিভিন্ন প্রকার খাদ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রস্তুত করতে পারা ঃ তাঁবু বাস চলাকালীন কেন্দ্রীয়ভাবে রেশন সরবরাহ করা হয়ে থাকে। দায়িত্বপ্রাপ্ত রোভার স্কাউট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয় সময় অনুযায়ী খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কোয়ার্টার মাস্টারের কাছে জমা দিয়ে আসবে। জমাকৃত সরঞ্জামের মধ্যে একটি স্লিপে উপদলের নাম এবং সদস্য সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে। এতে কোয়ার্টার মাস্টারের দায়িত্বে যারা নিয়োজিত তাদের কাজের সুবিধা হবে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ে আবার রেশন সংগ্রহ হবে। যদি কেন্দ্রীয়ভাবে রেশন সরবরাহ করা না হয় তাহলে পূর্বে প্রণীত খাদ্য তালিকা অনুযায়ী প্রতিদিন স্থানীয় কাঁচাবাজারে গিয়ে প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করে আনতে হবে। যেসব দ্রব্যাদি পঁচনশীল নয় সেগুলো একত্রে কেনা যেতে পারে। কেবলমাত্র পচনশীল খাদ্যদ্রব্য প্রতিদিন কেনা উচিত। মালামাল সংগ্রহ করার পর প্রতিটি জিনিস ভিন্ন ভিন্ন রাখা প্রয়োজন।

ভাত রান্না করা ঃ উপদলের সদস্য হিসাবে চাল মেপে নিতে হবে। চাল মেপে ঐ চালকে ভালভাবে ২/৩ বার ধুয়ে নিতে হবে। চাল ধোঁয়ার পর পরিমাণ মত পানি দিয়ে হাড়িকে চুলার উপর বসিয়ে দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। মাঝে মাঝে চামচ দিয়ে হাড়ির মধ্যকার চাল নেড়ে দিতে হবে। আগুনের তাপে চাল সেদ্ধ হয়ে যাবে। এখন ২/৩টি ভাত টিপে দেখতে হবে ভাত নরম হয়ে খাওয়ার মত হয়েছে কিনা। যদি দেখা যায় যে ভাত নরম হয়ে খাওয়ার মত হয়েছে তখন হাড়িটি চুলার উপর থেকে

নামিয়ে হাড়ির উপর ঢাকনি দিয়ে হাড়িকে এক পাশে কাত করে ধরতে হবে। এভাবে হাড়িকে কাত করে ধরলে ভাতের ফ্যান পড়ে যাবে। ভাতের ফ্যান সব পড়ে গেলে হাড়িকে দু'হাতে ধরে ভাল করে ঝাঁকিয়ে দিতে হবে। এরপর হাড়িকে আবার ১ (এক) মিনিটের জন্য চুলার উপর দিতে হবে। এরপর চুলা থেকে হাড়ি নামিয়ে নিতে হবে।

ভাজি রান্না ঃ যে তরকারী দিয়ে ভাজি রান্না হবে সেই তরকারীকে পরিষ্কার পানি দিয়ে ২/৩ বার ধুয়ে নিতে হবে। এবার ঐ তরকারীকে খুব কুচি কুচি করে পরিষ্কার কোন পাত্রে রাখতে হবে। তরকারীকে কুচি কুচি করে কাটা শেষ হলে একটি হাড়ি জলন্ত চুলাতে বসিয়ে হাড়িতে তেল দিয়ে ঐ তেল গরম করতে হবে। তেল গরম হয়ে গেলে কুচি কুচি করে কাটা পেঁয়াজ ঐ তেলে ছেড়ে দিতে হবে। পেঁয়াজের রং বাদামী আকার ধারণ করলে ভাজির তরকারী হাঁড়িতে দিয়ে অন্যান্য মশলা, লবণ, কাঁচামাল তরকারীতে দিতে হবে। মাঝে মাঝে তরকারী চামচ দিয়ে নেড়ে দিতে হবে। তরকারী যখন শুকিয়ে হাড়ির সাথে লেগে যাচ্ছে বলে মনে হবে তখন হাড়িতে পরিমাণ মত পানি দিয়ে হাড়ি ঢেকে দিতে হবে। এই পানিতে তরকারী সিদ্ধ হয়ে যাবে। তরকারী যখন সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন তরকারীর সামান্য দুই টুকরো মুখে দিয়ে দেখতে হবে ভাজিতে লবণ এবং মশলা যথাযথ হয়েছে কিনা। যদি দেখা যায় লবণ বা মশলা যথাযথ হয়নি, তাহলে পরিমাণ মত লবণ বা মশলা আবার ভাজির মধ্যে দিয়ে চামচ দিয়ে ভালভাবে নেড়ে দিতে হবে। ভাজি নরম হয়ে খাওয়ার উপযোগী হলে হাঁড়িটি জ্বলন্ত চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে।

মাংস রান্না ঃ মাংস ২/৩ বার পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিতে হবে। পানিতে ধোয়ার সময় মাংসে যদি কোন পর্দার মত আবরণ থাকে তা উঠিয়ে ফেলতে হবে। মাংস ভালভাবে ধোয়া শেষ হলে একটি হাড়িতে মাংস রেখে মাংসের সাথে তেল, লবণ ও অন্যান্য মশলা দিয়ে ভালভাবে হাত দিয়ে নেড়ে দিতে হবে। এবার ঐ হাড়িকে জ্বলন্ত চুলার উপর চাপিয়ে দিতে হবে। হাড়ি চুলার উপর দেয়ার পর মাঝে মাঝে চামচ দিয়ে মাংস নেড়ে দিতে হবে। হাড়ি যখন প্রায় শুকিয়ে যাবে তখন ঐ হাড়ির মধ্যে পরিমাণ মত পানি দিতে হবে। এই পর্যায়ে মাংসে গরম মশলা দিতে হবে এবং পরবর্তীতে মাংসে আলু বা অন্য তরকারী দেয়া যেতে পারে। মাঝে মাঝে চামচ দিয়ে মাংস নেড়ে দিতে হবে। ঝোল চামচে তুলে মুখে দিয়ে দেখতে হবে মাংসে লবণ ও মশলা যথাযথ হয়েছে কিনা। যদি দেখা যায় যে মাংসে লবণ বা মশলা যথাযথ হয়নি তাহলে পরিমাণ মত লবণ বা মশলা দিতে হবে। মাংস যখন নরম হয়ে খাওয়ার উপযোগী হবে এবং মাংসে পরিমাণ মত ঝোল থাকবে তখন হাড়ি জ্বলন্ত চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে।

চা তৈরি ঃ একটি হাড়ি বা কেতলী পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে যত কাপ চা তৈরি করতে হবে তার চেয়ে এককাপ বেশি পানি ঐ হাড়ি বা কেতলীতে দিয়ে ঢাকনি দিয়ে ঐ হাড়ি বা কেতলী জ্বলন্ত চুলার উপর চাপিয়ে দিতে হবে। আগুনের তাপে যখন হাড়ি বা কেতলীর পানি টগবগ করে ফুটতে শুরু করবে, তখন ঐ হাড়ি বা কেতলীকে জ্বলন্ত চুলার উপর থেকে নামিয়ে যত কাপ পানি দেয়া হয়েছিল তত চা-চামচ চা পাতা হাড়ি বা কেতলীতে দিয়ে হাড়ি বা কেতলীর মুখ ঢাকনি দিয়ে বন্ধ রাখতে হবে। তিন থেকে চার মিনিট রাখার পর ছাঁকনি দিয়ে ছেকে এই লিকার কাপে কাপে দিতে হবে। কাপে লিকার দেয়া হলে চিনি দিয়ে নাড়তে হবে। পরে পরিমাণ মত দুধ দিতে হবে।

৯। উপদলের সদস্যদের জন্য তাঁবু বাসের স্থান নির্বাচন, প্রোগ্রাম প্রণয়ন, বাজেট তৈরি, বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

স্থান নির্বাচন ঃ কি কি সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান থাকলে কোন স্থানকে তাঁবু বাসের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত বলা হয়েছে বিধায় এখানে নতুন করে আর কিছু বলা হল না।

বাজেট তৈরি ঃ একটি উপদলের জন্য তাঁবু বাস খরচের খসড়া বাজেট নিম্নে দেওয়া হলো।

তাঁবু বাসের বাজেট

(২ দিনের ৬ জনের ১টি উপদলের জন্য)

ব্যয়	টাকা	আয়	টাকা
প্রশিক্ষণ উপকরণ ক্রয়	৫০০/-	রেজিস্ট্রেশন (১৫০X৬)	৯০০/-
খাদ্য (৬ জন সদস্যের) ২ দিনে	১৮০০/-	ক্রু মিটিং এর চাঁদা	৩০০/-
(১৫০X৬X২)	-	গ্রুপ তহবিল থেকে বরাদ্দ	১৩০০/-
যাতায়াত (৬X৫০)	৩০০/-	অনুদান	-
বিবিধ	৪০০/-		৫৩০/-
মেট ব্যয়	৩,০০০/-	মোট আয়	৩০০০/- -

(কর্মসূচি সহকারে বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ঃ নিম্নে তাঁবু বাসের দৈনন্দিন কর্মসূচি ও বিস্তারিত প্রোগ্রাম প্রদান করা হলো।)

তাঁবুবাসের দৈনন্দিন কর্মসূচি খসড়া

৫-০০ ঘন্টা ঃ শয্যা ত্যাগ, প্রাতঃক্রিয়া, প্রার্থনা

৫-৩০ ঘন্টা ঃ শরীর চর্চা

৬-৩০ ঘন্টা ঃ সকালের নাস্তা

৭-০০ ঘন্টা ঃ পরিদর্শন

৭-৩০ ঘন্টা ঃ পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান

৮-০০ ঘন্টা ঃ অধিবেশন/কার্যক্রম

১০-০০ ঘন্টা ঃ চা-বিরতি

১০-৩০ ঘন্টা ঃ অধিবেশন/কার্যক্রম

১২-৩০ ঘন্টা ঃ রেশন সংগ্রহ, রান্না, গোসল, দুপুরের খাবার, প্রার্থনা, অবসর সময়ের কাজ, বিশ্রাম

১৪-৩০ ঘন্টা ঃ অধিবেশন/কার্যক্রম

১৬-৩০ ঘন্টা ঃ বিকালের চা, প্রার্থনা

১৭-০০ ঘন্টা ঃ খেলাধুলা

১৮-০০ ঘন্টা ঃ পতাকা নামানো, রেশন সংগ্রহ, রান্না রাতের খাবার, প্রার্থনা

২০-৩০ ঘন্টা ঃ তাঁবু জলসা

২১-৩০ ঘন্টা ঃ বিছানা প্রস্তুত, শয্যা গ্রহণ

২২-০০ ঘন্টা ঃ বাতি নিভানো ও সম্পূর্ণ নিরবতা পালন

দ্রষ্টব্য ঃ মৌসুমের সাথে সংগতি রেখে প্রয়োজনবোধে এই কর্মসূচি পরিবর্তন করে নিতে হবে।

তাঁবুবাসের প্রোগ্রাম খসড়া

১ম দিন

১৬-০০ ঘন্টা ঃ তাঁবু বাস এলাকায় উপস্থিতি, তাঁবু খাটানো, স্থিতি লাভ

১৭-০০ ঘন্টা ঃ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

১৭-৩০ ঘন্টা ঃ বিকালের চা, প্রার্থনা

১৮-০০ ঘন্টা ঃ পতাকা নামানো

২০-৩০ ঘন্টা ঃ তাঁবু বাসের নিয়মাবলী, সেশন খাতা লেখার নিয়মাবলী, তাঁবু জলসা

২য় দিন

৮-০০ ঘন্টা ঃ স্কাউট আদর্শ

১০-৩০ ঘন্টা ঃ পতাকাসমূহঃ

(ক) জাতীয় পতাকা

(খ) স্কাউট পতাকা

(১) রোভার আঞ্চলিক স্কাউটস পতাকা

(২) জেলা রোভার স্কাউটস পতাকা

(৩) রোভার স্কাউটস গ্রুপ/ইউনিট পতাকা

১৪-৩০ ঘন্টা ঃ দড়ির কাজ

(ক) দড়ির মুখ বাঁধা (Whipping the end of a Rope)

(খ) বড়শী গেরো (Clove Hitch), ডাক্তারী গেরো (Reef Knot), পাল গেরো (Sheet Bend), গুড়ি টানা গেরো (Timber Hitch), জীবন রক্ষা গেরো (Bowline), তাঁবু গেরো (Round Turn and two Half Hitches), জেলে গেরো (Fishermen's Knot)

১৫-৩০ ঘন্টা ঃ দড়ির কাজ

(ক) স্কয়ার ল্যাশিং (Square Lashing)

(খ) ডায়াগোনাল ল্যাশিং (Diagonal Lashing)

(গ) পোল এন্ড শিয়ার ল্যাশিং (Pole & Sheer Lashing)

১৭-০০ ঘন্টা ঃ খেলাধুলা

২১-৩০ ঘন্টা ঃ তাঁবু জলসা

৩য় দিন

৮-০০ ঘন্টা ঃ প্রাথমিক প্রতিবিধান

(ক) প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর গুণাবলী, দায়িত্ব ও কর্তব্য

(খ) মানবদেহের গঠন ও বিভিন্ন অংশের কার্যাবলী

(গ) সাধারণ ক্ষতের চিকিৎসা

৯-০০ ঘন্টা ঃ কোড ও সাইফার

চাবি পদ্ধতি উল্টা হরফ পদ্ধতি

১০.০০ : চা-বিরতি

১০-৩০ ঘন্টা ঃ কম্পাস ও মানচিত্র

(ক) কম্পাসের সাহায্যে দিক নির্ণয়

(খ) কম্পাসের সাহায্য ছাড়া দিক নির্ণয়

(গ) মানচিত্র কি?

(ঘ) মানচিত্র কিভাবে আঁকতে হয়

(ঙ) মানচিত্র আঁকা (গ্রুপ ওয়ার্ক)

১৪-৩০ ঘন্টা ঃ চূড়ান্ত পরিদর্শন

১৫-০০ ঘন্টা ঃ সমাপনী অনুষ্ঠান

১৫-৩০ ঘন্টা ঃ তাঁবু এলাকা ত্যাগ (তাঁবুবাসের প্রোগ্রাম দলের প্রয়োজন মত পরিবর্তন করা যেতে পারে)

খ। রোভার মেট কোর্সে সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণঃ

প্রতি বছর জেলা রোভার, রোভার আঞ্চলিক স্কাউটস এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের তত্ত্বাবধানে রোভার মেট কোর্স আয়োজন করা হয়। উক্ত কোর্সগুলোতে অংশগ্রহণ করে একজন রোভার রোভার মেট কোর্স সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করতে পারে।

মেট কোর্সের বিবরণ লগ বইয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। কোর্সের স্থান, সময়, প্রশিক্ষক, পরিবেশ, অংশগ্রহণকারী, খাবার ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে অনধিক ১ পাতায় বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

গ। রোভার কুশলী ব্যাজ অর্জন

০১। রোভার স্কাউট গ্রুপের গঠন সম্পর্কে জানাঃ

সাধারণ ভাবে একটি কাব, একটি স্কাউট ও একটি রোভার ইউনিটের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ স্কাউট গ্রুপ গঠিত হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে একাধিক রোভার স্কাউট ইউনিট নিয়ে রোভার স্কাউট গ্রুপ গঠিত হতে পারে।

০২। ইউনিট কাউন্সিলের গঠন সম্পর্কে জানাঃ

(ক) রোভার ইউনিটে আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, প্রশাসন, তহবিল ও ব্যয় সম্পর্কিত বিষয়ে এবং রোভার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার্থে রোভার স্কাউট লিডার, সহকারী রোভার স্কাউট লিডার, রোভার মেট, সহকারী রোভার মেট এবং রোভার স্কাউটদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে রোভার স্কাউট ইউনিট কাউন্সিল গঠিত হবে।

(খ) দু'টি উপদল বিশিষ্ট রোভার ইউনিটের ক্ষেত্রে পুরো দলই এরূপ পরিষদের কার্যাবলী পরিচালনা করবে।

(গ) সিনিয়র রোভার মেট ইউনিট কাউন্সিলের সভাপতি এবং পরবর্তী সিনিয়র রোভার মেট সম্পাদক হবেন। রোভার স্কাউট লিডার ও সহকারী রোভার স্কাউট লিডারগণ কাউন্সিলের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন। [সূত্র ঃ গঠন ও নিয়ম {পৃঃ ১৬০(জ)}]

০৩। নিজ ইউনিট এর জন্য তিন মাসের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

০৪। নিজ উপদলের সদস্যদের সম্পর্কে জানা।

০৫। একটি ক্রু-মিটিং এর কার্যপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

নিজ ইউনিটের জন্য তিন মাসের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

তিন মাসের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার নমুনা

মাস	১ম সপ্তাহ	২য় সপ্তাহ	৩য় সপ্তাহ	৪র্থ সপ্তাহ

নিজ উপদলের সদস্যদের সম্পর্কে জানতে হবে।

৬ জন রোভার নিয়ে একটি উপদল গঠিত হয়। একজন রোভারকে তার উপদলের সদস্যদের সম্পর্কে জানতে হবে।

ক্রু মিটিংঃ ক্রু মিটিং হচ্ছে রোভার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য ৬০-৯০ মিনিটব্যাপী প্রশিক্ষণদানের লক্ষ্যে নিয়মিত সাপ্তাহিক রোভার স্কাউট কর্মসূচী। ক্রু মিটিংয়ের যে সকল বিষয় রোভারদের শেখানো হয় সে বিষয়গুলো ইউনিট লিডার, সহকারী ইউনিট লিডার, ইনস্ট্রাক্টর, বিশেষজ্ঞগণ ক্রু মিটিং শুরু হওয়ার আগে রোভার মেটদের ভালভাবে শিখিয়ে দেন। পরবর্তীতে ক্রু মিটিং চলাকালীন রোভার মেটরা সহকারী ইউনিট লিডার ও ইনস্ট্রাক্টরদের সহায়তায় নিজ নিজ উপদল সদস্যদের সেই সব বিষয় হাতে-কলমে শেখায়। ক্রু মিটিংয়ে কেবলমাত্র ব্যবহারিক বিষয় শেখানো হয়। ক্রু মিটিং চলাকালীন ইউনিট লিডার ঘুরে ঘুরে রোভার মেটদের কার্যাবলী পর্যবেক্ষন করবেন ও পরবর্তীতে ক্রু মিটিং মূল্যায়নের সময় রোভার মেটদের ত্রুটিগুলো সংশোধন করে সঠিক বিষয়টি তাদের শিখিয়ে দিবেন।

ক্রু মিটিংয়ের প্রয়োজনীয়তাঃ ইউনিটে ক্রমোন্নতিশীল স্কাউটিং চালু রাখার জন্য ক্রু মিটিং একান্ত অপরিহার্য। স্কাউটিংয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হলো "হাতে কলমে কাজ করার মাধ্যমে শেখা"। নিয়মিত ক্রু মিটিং না হলে রোভারদের হাতে-কলমে কাজ করার সুযোগ কমে যায় এবং এর কার্যক্রম স্থিমিত হয়ে পড়ে। তারা ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। কেবলমাত্র ক্রু মিটিংয়ের মাধ্যমেই কোন নির্দিষ্ট বিষয় হাতে-কলমে শিখিয়ে দক্ষতা অর্জন করানো সম্ভব। ফলে রোভাররা বিষয় ভিত্তিক দক্ষতা লাভ করে নির্দিষ্ট ব্যাজ অর্জনে সক্ষম হয়।

সফল ক্রু-মিটিংয়ের উপদান ঃ ১) প্রশিক্ষক দল, ২) আকর্ষণীয়, বৈচিত্র্যময় ও রোমাঞ্চকর কর্মসূচি এবং ৩) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ উপকরণ।

১) প্রশিক্ষক দল ঃ ইউনিট লিডার, সহকারী ইউনিট লিডার, ইনস্ট্রাক্টর ও বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা প্রশিক্ষক দল গঠিত হয়। প্রশিক্ষক দল না থাকলে ইউনিট লিডার নিজে রোভার মেটদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রশিক্ষক দল গঠনের চেষ্টা করবেন।

২) আকর্ষণীয়, বৈচিত্র্যময় ও রোমাঞ্চকর কর্মসূচি ঃ রোভার বয়সী যুবক/যুবতীদের জন্য আকর্ষণীয়, বৈচিত্র্যময় ও রোমাঞ্চপূর্ণ কর্মসূচি প্রনয়ণের দল গঠনের চেষ্টা করবেন।

কোন ক্রু-মিটিংকে সফল করে তোলার জন্য এবং ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ক্রু মিটিংয়ের কর্মসূচি এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যার মধ্যে থাকবে রোভার বয়সী যুবক/যুবতীদের আগ্রহ বজায় রাখার মত আকর্ষণীয়, বৈচিত্র্যময় ও রোমাঞ্চকর কার্যক্রম। যার ফলশ্রুতিতে ক্রু মিটিংয়ের সফলতা ও যুবক/যুবতীদের চাহিদার পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

৩) প্রশিক্ষণ উপকরণ ঃ প্রশিক্ষণ উপকরণের সরবরাহ থাকলে রোভারা হাতে-কলমে ব্যবহারিক কাজ করার সুযোগ পায়। ফলে সেই বিষয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ক্রু মিটিংয়ে ব্যবহারিক বিষয় শেখানোর ফলে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ উপকরণ ইউনিটে পর্যাপ্ত পরিমানে সংরক্ষণ করা আবশ্যক।

ক্রু মিটিংয়ের নমুনা কর্মসূচি

আরম্ভের সময় ঃ ৩.০০টা, শেষ হওয়ার সময় ঃ ৪:৩০ মিনিট।

কার্যক্রম	দায়িত্ব	সময়
উপস্থিতি	সিনিয়র রোভার মেট	০১ মিঃ
পতাকা উত্তোলন	রোভারস্কাউট লিডার	০২ মিঃ
প্রার্থনা সংগীত	রোভার	০৩ মিঃ
পরিদর্শন, চাঁদা আদায় ও রিপোর্টিং	রোভার মেট	০৬ মিঃ
ঘোষণা	রোভারস্কাউট লিডার	০৩ মিঃ
খেলা/গান/নাচ/গল্প/অভিনয়	রোভার মেট	০৬ মিঃ
পুরাতন পাঠের অনুশীলন (বিষয়:------------------)	রোভার মেট	২৫ মিঃ
খেলা/গান/প্রতিযোগিতা	রোভার মেট	০৬ মিঃ
নতুন পাঠ (বিষয়:--------------------------------)	রোভার মেট	২৫ মিঃ
খেলা/গান/প্রতিযোগিতা	রোভার মেট	০৬ মিঃ
পতাকার কাছে সমবেত হওয়া	সিনিয়র রোভার মেট	০২ মিঃ
ঘোষণা/প্রার্থনা	রোভারস্কাউট লিডার	০৩ মিঃ
পতাকা নামানো	রোভার স্কাউড লিডার	০১ মিঃ
ছুটি	সিনিয়র রোভার মেট	০১ মিঃ
	মোট সময়	৯০ মিঃ

বিঃদ্রঃ ক্রু মিটিং কর্মসূচী ৬০-৯০ মিনিটের হতে হবে।
(উপরোক্ত নমুনা কর্মসূচি ইউনিটের প্রয়োজনে পরিবর্তন করা যেতে পারে।)

১৪। শিক্ষকতা ব্যাজ

শিক্ষকতা ব্যাজ ঃ

জেলা রোভারস্কাউট কমিশনারের অনুমোদন নিয়ে শিক্ষকতা ব্যাজ অর্জনের জন্য কমপক্ষে ৩ মাস কাজ করতে হবে। ৩-৬ জন মিলে গ্রুপ করে অথবা একাই কাজ করা যাবে। এক্ষত্রে ৩ মাসে কমপক্ষে একজন নিরক্ষরকে অক্ষর জ্ঞান দান করতে হবে এবং একজন ছাত্র/ছাত্রীকে শ্রেণী শিক্ষাদানে সহায়তা করতে হবে (নিজ পরিবারের সদস্য ব্যতীত)।

অথবা, কমপক্ষে পাঁচজন ছিন্নমূলকে প্রাথমিক শিক্ষা দান করতে হবে। যেমন- তাদের নাম, ঠিকানা, স্বাক্ষর করা, পড়তে পারা ও ন্যূনতম লিখতে পারার মত শিক্ষা দিতে হবে।

অথবা, ছিন্নমূল স্কুল/বয়স্ক স্কুল/নাইট স্কুল/কমিউনিটি স্কুলে ৩ মাস সফলতার সাথে শিক্ষকতা করতে হবে।

কাজ চলাকালীন লগ বই সংরক্ষণ করতে হবে এবং কাজ সম্পন্ন করার পর লগ বই অনুমোদনের জন্য জেলা রোভারস্কাউট কমিশনারের বরাবর জমা দিতে হবে।

জেলা রোভারস্কাউট কমিশনার লগ বই অনুমোদন করলে রোভারস্কাউট লিডার মাই প্রোগ্রেস বই এ স্বাক্ষর করবেন তবেই ব্যাজ অর্জন সম্পন্ন হবে।

প্রোগ্রাম বইয়ে শিক্ষকতা ব্যাজ এর করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত দিক নির্দেশনা দেয়া আছে।

১৫। সমাজ সেবা/সমাজ উন্নয়ন

অন্ততঃ তিনটি সমাজ সেবা/সমাজ উন্নয়ন মূলক কাজে নূন্যতম ২৪ ঘন্টা অংশগ্রহণ করা (পূর্বেরটি ব্যতীত)

এই ধাপ অতিক্রম করার জন্য একজন রোভার স্কাউটকে অন্ততঃপক্ষে ২৪ ঘন্টা কোন সমাজ সেবামূলক কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। যেমন ঃ হজ্জ ক্যাম্পে সেবা প্রদান, শীতবস্ত্র সংগ্রহ ও বিতরণ, বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি প্রভৃতি। একজন রোভার স্কাউট যে সমাজ সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করবে তার বিবরণ যথা কাজের নাম, কাজের স্থান, কাজ করার তারিখ, কাজ করার দৈনিক সময় সীমা

ইত্যাদি উল্লেখ করে নিজের লগ বই এ লিখে রাখবে এবং লগ বইয়ের ঐ অংশ রোভার স্কাউট লিডারকে দেখিয়ে তার স্বাক্ষর করিয়ে নেবে এবং সনদপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

১। বিশ্ব সংরক্ষণ

বিশ্ব সংরক্ষণ বা পরিবেশ সংরক্ষণঃ

সংরক্ষণ কথাটি ল্যাটিন শব্দ থেকে প্রাপ্ত। (Contogether বা একত্রতা Survare=guard)

বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও পুর্নবাসন ব্যবস্থাপনাকে সংরক্ষণ বলে। পরিবেশ যথা মাটি, পানি বায়ু বন্য জীবজগৎ এবং আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক আচরণ দূষণ মুক্ত করা যায় সেই প্রক্রিয়াকে পরিবেশ সংরক্ষণ বলে।

আমাদের সামগ্রিক জীবনটাই পরিবেশের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত। আমাদের জীবনকে সুস্থ রাখতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুন্দর একটি পরিবেশ দেওয়ার জন্য আমাদের পরিবেশ সংরক্ষণ করতে হবে।
পরিবেশের উপাদান যেমন মাটি, পানি, বায়ু বন, জীব বৈচিত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে পারলেই আমাদের পরিবেশ সংরক্ষিত হবে। পরিবেশের উপাদান গুলোকে দূষণমুক্ত করলেই এবং যথাযথ ব্যবহার করলেই পরিবেশ তথা বিশ্ব সংরক্ষিত হবে।

২। পরিবেশ গঠনের উপাদান

১। মাটি ২। বায়ু ৩। পানি ৪। বন্য জীব জন্তু
৫। ময়লা আবর্জনা ৬। গাছপালা ৭। মানুষ
৮। পারিবারিক ও সমাজিক আরচণ ইত্যাদি।

মানুষের উপর পরিবেশের প্রভাবঃ

মানুষকে তার পরিবেশের উপর নির্ভর করেই জীবন ধারণ করতে হয়। মাটিতে উৎপাদিত শষ্য, খাদ্য গ্রহণ করে মানুষ বেঁচে আছে। গাছ অক্সিজেন ত্যাগ করে মানুষ তা গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। পানির অপর নাম জীবন, পানি মানুষের জীবনের জন্য অপরিহার্য, বন্য জীবজন্তু ইকো সিস্টেম তথা বস্তুতন্ত্রের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করছে। কোন কারণে এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যাঘাত ঘটলে অর্থাৎ পরিবেশের ভারসাম্য কোন কারনে বিঘ্নিত হলে তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল মানুষের জীবনযাত্রার উপর প্রভাব ফেলে। মাটি দূষণের ফলে খাদ্য শষ্য উৎপাদন কমে যাবে ফলে খাদ্য সংকট দেখা দবে। দূষিত পানি ব্যবহারের ফলে মানুষ বিভিন্ন

রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে। বাস্তুতন্ত্র বিঘ্নিত হলে বনের পরিবেশ নষ্ট হবে। এর ফলে বন্য জীব জন্তুর জন্য বনের পরিবেশ অযোগ্য হয়ে পড়বে। বিভিন্ন প্রজাতি বিলুপ্ত হবে। বন্য প্রাণী আবাসনের অভাবে লোকালয়ে প্রবেশ করবে যা মানুষের জন্য হুমকি স্বরূপ। বন্যহাতির আক্রমনে মানুষ আহত, নিহতের ঘটনা ও ঘটে। এর কারণে বন্য প্রাণীও হুমকির সম্মুখে। পরিবর্তন দেখা দেবে মানুষের সাথে মানুষেব স্বাভাবিক আচরণেব যা স্বাভাবিক জীবন য়াত্রাব জন্য হযে উঠবে অভিশাপ স্বরূপ।

মোট কথা পরিবেশের স্বাভাবিক নিয়মের ব্যাঘাত ঘটলে তার প্রভাব মানুষের উপর পড়বে। মানুষকে বাঁচতে হলে আগে পরিবেশকে বাঁচাতে হবে।

পরিবেশের ভারসাম্য কিভাবে নষ্ট হয়ঃ

পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। পরিবেশের নানা উপাদানের মধ্যে নানাবিধ চক্র সংগঠনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। পরিবেশের উপাদান সমূহের একটিকে বিঘ্নিত বা দূষিত করলেই এর ভারসাম্য নষ্ট হয়।

এই দূষনের কারণ প্রায়ই মানবসৃষ্ট। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বনউজার, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার। অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের অপব্যবহার। শিল্পায়ন পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার উল্লেখযোগ্য কারণ। আধুনিক শিল্পায়নের নামে হচ্ছে যত্রতত্র আবাসিক এলাকায় শিল্প কারখানা গড়ে তোলা। যা মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করছে। কল কারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া বায়ু দূষিত করছে। বর্জপদার্থ, অপদ্রব্য নদীতে ফেলে নদীর পানিকে দূষিত করছে। এর জলজ্যান্ত উদাহরণ বুড়িগঙ্গা পানি দূষণের কারণে বুড়িগঙ্গা তার আসল রূপ হারাচ্ছে। এছাড়া অবৈধভাবে জলাভূমি দখল করা হচ্ছে যার কারণে সৃষ্টি হচ্ছে জলাবদ্ধতা। যার শিকার আমরা ঢাকাবাসী। সর্বোপরি গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া, যার ফলে পৃথিবীর বৈষয়িক উত্তাপ বাড়ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উপায়ঃ

পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণগুলো দূর করলেই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য পরিবেশের উপাদানসমূহ যাতে দূষিত না হয় সে দিকে নজর রাখতে হবে। পাশাপাশি পরিবেশের নানাবিধ উপাদানের মধ্যে সংগঠিত চক্রসমূহ যাতে বিঘ্নিত না হয় সে দিকে নজর রাখতে হবে। যেমন-গাছপালা কাটা যাবেনা প্রয়োজনে কাটলেও সাথে সাথে একাধিক নতুন চারা রোপন করতে হবে। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিমিত ব্যবহার করতে

হবে। প্রয়োজনে ময়লা আবর্জনা যেখানে-সেখানে ফেলে বায়ু দূষিত না করে তা নির্দিষ্ট স্থানে জমা করে তা দিয়ে সার তৈরি করা যেতে পারে যা রাসায়নিক সারের বিকল্প হবে। পরিকল্পিত শিল্পায়নের মাধ্যমে আমরা পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে বাঁচাতে পারি। আইনের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা আমাদের অনিয়মগুলো দূর করে পরিবেশকে সুন্দর করতে পারি।

এছাড়া মানুষকে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে।

০৩। মাটি, পানি, বায়ু দূষিত হওয়ার প্রধান কারণ ও তা নিয়ন্ত্রনের উপায়

মাটিঃ মাটি হচ্ছে কতকগুলো প্রাকৃতিক বস্তুর সমষ্টি যা পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে উদ্ভিদের বিভিন্ন রকম সহায়তা দান করে এবং সময়ের পরিবর্তনের উৎস দ্রব্যের উপর সজীব বস্তু ও জলবায়ুর ক্রিয়া অনুযায়ী নির্দিষ্ট কিছু ধর্মপ্রাপ্ত হয়।

মাটি দূষণের কারণঃ
মাটির অপরিকল্পিত ব্যবহারই মাটি দূষণের কারণ। যেমন একই জমিতে সব সময় একই ফলস ফলানো ফলন বৃদ্ধির জন্য অধিক হারে রাসায়নিক সার ব্যবহার। কীটপতঙ্গ ধ্বংসের জন্য কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার মাটিতে কল কারখানার রাসায়নিক বিষাক্ত বর্জ্য পুতে রাখা। ময়লা আবর্জনাসমূহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলা। যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করা, অধিক হারে গাছপালা কেটে ফেলা এর ফলে মাটি তার উর্বরতা হ্রাস থেকে শুরু করে চিরস্থায়ী আবাদ অযোগ্য হয়ে পড়তে পারে। এছাড়া অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধিও মাটি দূষণের আরেকটি বিশেষ কারণ।

মাটি দূষণ দূর করার উপায়ঃ
দূষণের হাত থেকে মাটিকে মুক্ত রাখতে হলে একই জমিতে বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন ফসল ফলাতে হবে। রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার করতে হবে। কীটনাশকের ব্যাবহার কমাতে হবে। মাটিতে কল-কারখানার বিষাক্ত বর্জ্য পুতে রাখা যাবে না। ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে। নির্দিষ্ট স্থানে মলমুত্র ত্যাগ করতে হবে। সেই সাথে জনসংখ্যার অপরিকল্পিত বৃদ্ধি রোধ করতে হবে।

পানিঃ
মানুষের জীবন ধারনের জন্য পানি সবচেয়ে গুরুত্বর্পূন উপাদান। শুধু মানুষই নয় সমস্ত জীবের জন্য কথাটি প্রযোজ্য। তাই বলা হয় পানির অপর নাম জীবন । পৃথিবীর ৭১ শতাংশই হচ্ছে পানি। এই পানিকে ২ শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যথা- (১) পেয় পানি (২) অপেয় পানি।

দূষণের কারণঃ

নদী বা কুপ হতে আমরা খাওয়ার পানি সরবরাহ করে থাকি, এগুলো সাধারণত নর্দমার ময়লা দ্বারা কলুষিত হয়। শহরাঞ্চলের নর্দমাসমূহ সাধারণত নদীতে গিয়ে শেষ হয় এবং এগুলো দ্বারা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের মলমূত্র ও অন্যান্য ময়লা আবর্জনা নদীতে পতিত হয়। এছাড়া মানুষ বা অন্যান্য পশুর মল, খাদ্যদ্রব্যের অপ্রয়োজনীয় অংশ নদীতে পতিত হলে এগুলো ব্যাকটেরিয়ার প্রভাবে বর্জ্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়। এর জন্য প্রচুর অক্সিজেন খরচ হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোক প্রতিদিন যে পরিমান মলমূত্র ও আবর্জনা ত্যাগ করে তা অজৈব পদার্থে রূপান্তরিত করার সময় পানিতে দ্রবনীয় প্রায় ১০০ গ্রাম অক্সিজেন খরচ হয় যা ২০০০ গ্যালন পানিতে সাধারণত যে পরিমান অক্সিজেন দ্রবনীয় তার সমান। এ হারে অক্সিজেন কমতে থাকলে জলজ প্রাণীদের বেঁচে থাকা কষ্টকর হয়ে পড়বে।

শিল্পের আবর্জনীয় ঃ

পানি নিম্নলিখিত কারণে দুষিত হয় ঃ

শিল্প বিপ্লবের শুরু হতেই শিল্পসমূহ হতে নির্গত ময়লা ও আবর্জনা নদী ও সমূদ্রের পানি কলুষিত হওয়ার প্রধান কারণ হয়ে আসছে। কাগজ ও কাগজমন্ড, বস্ত্র-চিনি-সার, লৌহ জাতীয় ধাতু, চামড়া ও রাবার, ওষুধ ও রাসায়নিক শিল্প কারখানা হতে নির্গত আবর্জনা সমূহ বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানে গঠিত এদের উপস্থিতি পানিতে অক্সিজেনের ভাগ কমিয়ে দেয়। এছাড়া শিল্প কারখানা থেকে আর্সেনিক নামক বিষাক্ত পদার্থ পানিতে মিশে বিভিন্ন জীবের মধ্যে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

তাপমাত্রা বৃদ্ধিঃ

তাপমাত্র বৃদ্ধির সাথে সাথে পানিতে অক্সিজেনের ভাগ কমে যায়। শিল্প ও পারমানবিক চুলী সমূহকে ঠান্ডা রাখার জন্য প্রতিনিয়ত পানি সরবরাহ করা হয় এবং এসব পানি আবার গরম অবস্থায় নদীতে ফিরে আসে। এভাবে এসব স্থানের পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। বর্ধিত তাপমাত্রায় অক্সিজেনের পরিমান কমে যায় অনেক জলজ প্রাণী মারা যায়।

অ্যাসিড সমূহঃ

খনিসমূহ হতে নির্গত অ্যাসিডসমূহ পানিতে অ্যাসিডের হার বৃদ্ধি করে থাকে। পানিতে অ্যাসিডের পরিমান অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেলে বহু জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনের প্রতি এটি হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।

পলি ও তলানিঃ

ভূমি ও পাহাড় ধ্বংসের ফলে পানিবাহিত মাটি, বালুকনা ইত্যাদি পানিকে দূষিত করে। পানি ঘোলাটে হলে জলজ প্রাণীর ডিম ও লার্ভার স্বাভাবিক সৃষ্টি নষ্ট হয়ে যায়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। চলাফেরায় বিঘ্ন ঘটে এবং খাদ্যের অভাব ঘটে।

তেলঃ

পানিতে তেলের সংমিশ্রণ অথবা পানির উপর তেলের বিস্তার জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষতি সাধন করে। বিশেষ করে সমুদ্রে তেল বহনকারী ট্যাংকার থেকে অপরিশোধিত তেল দূর্ঘটনার ফলে নির্গত হলে পানিতে মিশে যায় এবং বহু এলাকা জুড়ে জীব কুলের ক্ষতি সাধন করে। বর্তমানে বাংলাদেশের নদ-নদী এমনকি হাওড় বিলেও চলাচলরত ইঞ্জিনের নৌকা, লঞ্চ, ইষ্টিমার হতে তেল নিঃসরনের ফলে পানি দূষিত হচ্ছে।

পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায়ঃ

১। শহরাঞ্চলের জৈব বর্জ্য পদার্থ মিশ্রিত পানি সরাসরি নদীতে না ফেলে শোধন করার ব্যবস্থা করা উচিত।

২। জীবজন্তুর মৃতদেহ পানিতে পচে গেলে পানি যেন দূষিত হতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

৩। শিল্প ও কারখানার বর্জ্য শোধন করে নেয়া।

৪। কীটনাশক, ছত্রাক নাশক, আগাছানাশক ঔষধ ও রাসায়নিক সারের যথেষ্ট ব্যবহার রোধ করতে হবে।

৫। পানিই জীবন এই কথার তাৎপর্য তুলে ধরে সবাইকে সতর্ক করে তোলা।

৬।পাস্টিক,পলিথিন, রাবার যেখানে সেখানে না ফেলে গর্তে পুতে মাটি চাপা দিয়ে রাখা উচিত।

৭। পরিষ্কারক দ্রব্যাদি পুকুরে ও নদীতে ব্যবহার না করা।

বায়ু ঃ

বায়ু হচ্ছে একটি মিশ্র পর্দাথ। এর মধ্যে আছে জীবন ধারণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন উপাদান। সব জীবের জীবন ধারণের জন্য শ্বসন একটি গুরুত্বপূর্ন প্রক্রিয়া যা অক্সিজেনের মাধ্যমে ঘটে। বাতাসে অক্সিজেনের পরিমান ২০.৬০%।

বায়ু দূষণের কারণঃ

বায়ু দূষণের জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলো উল্লেখ যোগ্যঃ

কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2)ঃ CO_2 একটি গ্রীণ হাউজ গ্যাস। বাতাসে CO_2 এর পরিমান ০.০৩১ ভাগ। সকল জীব শ্বসন ক্রিয়া কালে CO_2 গ্যাস বাতাসে ত্যাগ করে এবং সবুজ উদ্ভিদ আলোক সংশ্লেষণ ক্রিয়াকালে CO_2 গ্রহণ করে। বনভূমি ধ্বংস ও গাছ নির্বিচারে কাটার ফলে জীবকুলের ত্যাগ করা সবটুকু CO_2 গ্যাস বাতাস গ্রহণ করতে পারে না তাই বাতাসে CO_2 এর পরিমান বেড়ে যাচ্ছে। কল কারখানার চিমনী হতেও CO_2 গ্যাস বাতাসে যোগ হয়। সূর্যের বিকিরিত তাপের এক অংশ ধরে রেখে "গ্লোবাল ওয়ার্মিং" এ বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

ধোঁয়া ঃ এক ধরনের এরোসল বা দহনকৃত বস্তু নির্গত ও বাতাসে ভাসমান বলয়তাল কণা ও বাষ্পীভবন বা দহনোদ্ভুত গ্যাস নিয়ে গঠিত হয়, তাকে ধোঁয়া বলে। ধোয়ার প্রকোপ মূলত শহর ও শিল্প এলাকাতেই সীমিত থাকে। কারণ এখানকার দালান কোঠা ও প্রতিষ্ঠান এমনভাবে নির্মিত যার ফলে বাতাস অনেকটা আবদ্ধ থাকে।

ইগজোস্ট গ্যাসঃ এটি তেল জাতীয় জ্বালানীসমূহের দহন ক্রিয়ার ফল। এটি সাধারণত অদৃশ্যমান। ধোয়ার মত একে দেখা যায় না। এ জাতীয় গ্যাস সাধারণত ধোয়ার সাথে কারখানার চিমনী ও অটোরিকশা, বাস, ট্রাক হতে নির্গত হয়। এ গ্যাসে সীসা, তামা জিংক, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি ভারী ধাতু ও কার্বন মনোক্সাইড (CO), সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2), হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S), হাইট্রোজেন (HC) ও নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ (N_2O, NO_2, NO_3, N_2O_3) ইত্যাদি থাকে। দিন দিন শহরাঞ্চলের বায়ুতে এ ধরণের গ্যাসের ঘনত্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উপরে বর্ণিত গ্যাসগুলোর ঘনত্ব একটু বৃদ্ধি পেলে এরা জীবকুলের বেশ ক্ষতি সাধন করে।

সালফার ডাই অক্সাইড (SO): সাধারনত শিল্প কারখানা হতে এই গ্যাস বায়ুতে মিশে বিভিন্ন জ্বালানি দহনের ফলেই SO_2 সৃষ্টি হয়। বায়ুর সাথে মিশে গ্যাস সালফিউরিক (H_2SO_4) এসিড সৃষ্টি করে এবং অ্যাসিড সৃষ্টির মাধ্যমে জীবকুলের ক্ষতি সাধন করে।

ক্লোরো ফ্লুরো কার্বন (CFC): (CFC) হচ্ছে ক্লোরিন, ফ্লোরিন ও কার্বনের একটি উদ্বায়ী যৌগ। এটি একটি গ্যাস, এটি রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশন, প্লাস্টিক ও রং তৈরির কারখানা হতে নির্গত হয়। CFC বায়ুমন্ডলের ওপরের স্তরকে ক্রমশ ধ্বংস করছে। এক অনু CFC গ্যাস ২০০০ ওজন অনুকে ধ্বংস করতে পারে।

ইতিমধ্যেই ওজন স্তর অনেক জায়গায় পাতলা হয়ে গেছে এবং কোথাও কোথাও ছিদ্র হয়েছে বলেও ধারণা করা হচ্ছে। ওজন স্তর ছিদ্র হলে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি ও কসমিক রশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে এসে ফাইটোপাংকটন ও পরে অন্যান্য গাছপালা ধ্বংস করে দেবে। সেই সাথে প্রাণীকুলেরও ক্ষতি হবে প্রচুর। ক্যান্সার ও অন্যান্য রোগের প্রকোপ বেড়ে যাবে।

বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রনের উপায়ঃ

১। বৃক্ষ নিধন বন্ধ ও বেশী করে বন সৃষ্টি করা।

২। যানবাহনে সীসামুক্ত জ্বালানী ব্যবহার করা।

৩। যানবাহনে CNG ব্যবহার করা।

৪। ইটের ভাটা ও কলকারখানার চিমনী অনেক উঁচু করে দেয়া।

৫। ফসলের ক্ষেতে কীটনাশক, রাসায়নিক সার ব্যাবহার নিয়ন্ত্রণ করে জৈবিক নিয়ন্ত্রণ ও জৈব সার ব্যাবহার করা।

৬। কলকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য ও ক্ষতিকর গ্যাস নিয়ন্ত্রন করা।

৭। বসতি এলাকায় কোন কারখানা স্থাপন করতে না দেওয়া।

৮। বায়ু থেকে ধুলা ও ধোঁয়া অপসারণের ব্যবস্থা করা।

৯। বায়ু দূষণের উৎস ও ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করা।

১০। পারমানবিক বিস্ফোরণ না ঘটানো।

৪। দুইটি ফলজ বৃক্ষ রোপন ও পরিচর্যা ঃ

আমাদের দেশে অনেক রকমের ফল গাছ রয়েছে। এ সকল গাছ যেমন ফল দেয় তেমনি পাশাপাশি অনেক গাছ থেকে ঔষধ এবং কাঠ পাওয়া যায়। যেমন আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, লিচু, আমড়া, বরই, কলা ইত্যাদি। বনায়নের উদ্দেশ্যে গাছ লাগাতে হলে সাধারণত বড় ধরণের গাছপালাই লাগানো উচিত। বসত ভিটায় গাছপালা লাগাতে হলে ফলজ, বনজ, ঔষধী সবধরণের গাছপালা লাগানো যায়। প্রথমেই নিয়মতান্ত্রিক ভাবে জমি তৈরি করতে হবে। নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে ২ x ২ x ২ গর্ত তৈরি করতে হবে। সম পরিমান মাটি ও গোবর সার দিয়ে গর্তটি পূর্ণ করে কমপক্ষে ২৫ দিন রাখতে হবে। এরপর সে স্থানে গাছের চারা রোপন করা যাবে। এরপর খেয়াল রাখতে হবে যাতে গাছে পোকা না ধরে। ধরলে ঔষধ এবং নিয়মিত

পানি দিতে হবে। তবে গাছের গোড়ায় যাতে পানি না জমে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এতে গাছ মারা যেতে পারে। স্থান নির্বাচনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে গাছ পর্যাপ্ত সূর্যালোক পেতে পারে। প্রয়োজনে আমরা বিশেষজ্ঞদের সহায়তাও গ্রহণ করতে পারি।

১৬। স্বাস্থ্য পরিচর্যা

প্রাথমিক প্রতিবিধান সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞানার্জনঃ

(১) সাধারণ ক্ষতের চিকিৎসা

হুল ফোটানোঃ মৌমাছি, বোলতা, ভোমরা ইত্যাদি পতঙ্গ মানুষের শরীরে হুল ফোটায়। এদের হুলে এক রকম বিষাক্ত পদার্থ থাকে যা মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে মানুষ এ বিষাক্ত পদার্থের ক্রিয়ার ফলে যন্ত্রণায় অস্বস্তি এবং অস্থির বোধ করে। চিমটির সাহায্যে শরীরের চামড়ার উপরের অংশে হুলের যে অংশ থাকে, সেটা ধরে টান দিয়ে হুল বের করা যায় অথবা পিঁয়াজের খোসা ছিঁড়ে পিঁয়াজ দিয়ে হুল ফুটানো জায়গায় ঘষলে পিঁয়াজের সঙ্গে ঐ হুল আটকে শরীর থেকে বেরিয়ে আসে।

থ্যাতলানোঃ কোন আঘাতের ফলে যখন শরীরের আহত স্থান কেটে যায় না এবং আহত স্থান থেকে রক্ত বের হয় না অথচ ঐ অংশের মাংসপেশী ও তার আশেপাশের তন্তুসমূহ প্রবলভাবে আহত হয় ঐ অবস্থাকে থ্যাতলানো বলা হয়। শরীরের কোন অংশ থেতলে গেলে তার প্রতিকারের জন্য আহত স্থানে ঠান্ডা পানির পট্টি লাগাতে হবে। আহত অঙ্গের থ্যাতলানো অংশের ভেতরের টিস্যু ও অন্ত্রসমূহ ছিঁড়ে গেছে কিনা তা জানার জন্য আহত ব্যক্তিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে পরীক্ষা করাতে হবে।

(২) প্রাথমিক প্রতিবিধান কাজে ব্যবহৃত নিম্নোক্ত বিভিন্ন উপকরণ কি কি কাজে ব্যবহার করা হয় সে সম্পর্কে নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে বলা হল।

ব্যান্ডেজ ঃ আমাদের দেশে সাধারণত ঃ দু'ধরনের ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা হয়। প্রথমটি রোলার ব্যান্ডেজ এবং অপরটি হচ্ছে ত্রিকোণী ব্যান্ডেজ। শরীরের কোন অংশ কেটে গেলে এবং সেখানে যদি ব্যান্ডেজ বাঁধার সুযোগ থাকে তাহলে সেখানে ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়। শরীরের কোন অংশ ভেঙ্গে গেলে সেখানে প্যাড এবং স্পিন্ট ব্যবহার করে প্যাড এবং স্পিন্টকে যথাস্থানে রাখার জন্য ঐ স্পিন্টের উপর ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়।

স্প্লিন্ট ঃ শরীরের কোন অংশ ভেঙ্গে গেলে আহত অঙ্গকে অধিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ও আহত অঙ্গের স্বাভাবিক সঞ্চালন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য প্যাড ও স্প্লিন্ট দিয়ে আহত অঙ্গকে বেঁধে আহত অঙ্গে স্বাভাবিক সঞ্চালন ক্রিয়াবন্ধ করে আহত অঙ্গকে অধিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়াস চালানো হয়।

স্লিং ঃ গলার সাথে পেঁচিয়ে একটি কাপড়কে বুকের নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হয়। এই ঝুলন্ত কাপড়ের মধ্যে আহত হাতকে রেখে আহত হাতকে আয়েশ দেয়া হয়। এই ঝুলন্ত কাপড়কে স্লিং বলা হয়। আহত হাতকে আয়েশ রাখার জন্য স্লিং ব্যবহার করা হয়।

টুর্ণিকেটঃ ধমনী কেটে গেলে আঙ্গুলের চাপ দিয়ে যদি সেই রক্তপাত বন্ধ করা না যায় তাহলে সেক্ষেত্রে রবারের নির্মিত টুর্নিকেট দ্বারা ক্ষতস্থান থেকে হৃৎপিন্ডের দিকে নিকটতম প্রেসার পয়েন্টে পেঁচিয়ে বেঁধে দিয়ে ধমনী থেকে রক্তপাত বন্ধ করা যায়। ধমনীর রক্ত বন্ধ করার কাজে টুর্ণিকেটের ব্যবহার করা হয়। টুর্ণিকেট ব্যবহার করা হলে ১৫ মিনিট অন্তর টুর্ণিকেট বাঁধন ১মিনিট বা যতক্ষণ পর্যন্ত গাত্র বর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত আলগা করে দিতে হবে।

প্যাডঃ প্রাথমিক প্রতিবিধানে প্যাড দু'কাজে ব্যবহার করা হয়। এর একটি হচ্ছে স্প্লিন্ট ব্যবহারের সময় স্প্লিন্টের নিচে প্যাড দিতে হয়, যাতে স্প্লিন্ট শরীরের সাথে বাঁধার পর শরীরে ব্যথা না লাগে। অপরটি হচ্ছে কোন স্থানে ড্রেসিং দেয়ার পর ঐ ড্রেসিংয়ের উপর প্যাড দেওয়া হয় যাতে ঐ ড্রেসিংটি যথাস্থানে থাকে। এরপর ঐ জায়গায় ব্যান্ডেজ বাঁধতে হয়।

ড্রেসিং ঃ শরীরের কোন ক্ষতস্থানকে বাইরের জীবাণু থেকে মুক্ত রাখার জন্য ক্ষতস্থানের উপর ড্রেসিং ব্যবহার করা হয়। ড্রেসিং হিসেবে কোন পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো ব্যবহার করতে হবে।

(৩) অস্থিভঙ্গ কি, বিভিন্ন প্রকার অস্থিভঙ্গ ও তার কারণ, অস্থিভঙ্গের লক্ষণ ও বিভিন্ন প্রকার সাধারণ অস্থিভঙ্গে প্রাথমিক প্রতিবিধান।

অস্থিভঙ্গ কি? ঃ দেহ কাঠামোর কোন হার ভেঙ্গে গেলে তাকে অস্থি ভঙ্গ বলে।

বিভিন্ন প্রকার অস্থিভঙ্গঃ নিম্নে বিভিন্ন প্রকার অস্থি ভঙ্গের নাম দেয়া হলঃ

(ক) সরল অস্থি ভঙ্গ (Simple Fracture) ঃ সরল অস্থি ভঙ্গের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট হাড় ভেঙ্গে যায়। সংশ্লিষ্ট আহত হাড়ের আশপাশের তন্তুসমূহের কোন প্রকার ক্ষতি হয় না।

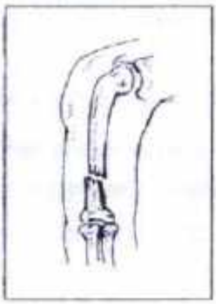

(খ) মিশ্র অস্থি ভঙ্গ (Compound Fracture) ঃ মিশ্র অস্থি ভঙ্গের ক্ষেত্রে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে অস্থি ভেঙ্গে যায় এবং সেই সাথে তার চারিপাশের তন্তু, চামড়া ইত্যাদি এমনভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় যে, বাইরের থেকে রোগ জীবাণু এই ক্ষতস্থানের মধ্যে দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। এই ধরণের অস্থি ভঙ্গের হাড় চামড়া ভেদ করে বাইরে আসতে পারে অথবা চামড়ার উপরিভাগ থেকে ভাঙ্গা হাড় পর্যন্ত একটি গর্ত সৃষ্টি হতে পারে।

(গ) জটিল অস্থি ভঙ্গ (Complicated Fracture) ঃ জটিল অস্থি ভঙ্গের ক্ষেত্রে আঘাতপ্রাপ্ত অস্থি ভেঙ্গে যায় এবং সেই সাথে অভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্র যেমন-মাথা, ফুসফুস, হৃৎপিন্ড, মেরুদন্ড ইত্যাদি অথবা প্রধান ধমনী বা শিরা কিংবা স্নায়ু আঘাত প্রাপ্ত হয়। অস্থির উপরে অনিষ্টের প্রকারভেদে আঘাতকে আবার নিম্নোক্ত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারেঃ (১) বহু ভঙ্গ (২) গ্রীন স্টিক ও (৩) সংবিদ্ধ।

(১) বহু ভঙ্গ (Comminuted) ঃ বহু ভঙ্গ অস্থি ভঙ্গের ক্ষেত্রে ভগ্ন অস্থিসমূহ একাধিক খন্ড খন্ড অংশে ভেঙ্গে যায় এবং এর জন্য আহত অংশ নাড়াচাড়া করার সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

(২) গ্রীন স্টিক (Green Stick)ঃ হাড় যখন পুরোপুরিভাবে না ভেঙ্গে বেঁকে যায় বা সামান্য ফেটে যায় তখন তাকে গ্রীন স্টিক বলে। শিশুদের হাড় উচ্চ ও মজবুত নয় বলে তাদের ক্ষেত্রে গ্রীন স্টিক দেখা দেয়।

(৩) সংবিদ্ধ (Impacted) ঃ সংবিদ্ধ অস্থি ভঙ্গের ক্ষেত্রে হাড় ভেঙ্গে হাড়ের এক অংশ অপর অংশের মধ্যে ঢুকে যায়।

অস্থি ভঙ্গের কারণঃ নিম্নলিখিত কারণে অস্থি ভঙ্গ হয়ে থাকে।
(ক) প্রত্যক্ষ বা সরাসরি চাপ প্রয়োগ
(খ) পরোক্ষ বা দূরবর্তী চাপ প্রয়োগ
(গ) পৈশিক চাপ প্রয়োগ

(ক) প্রত্যক্ষ বা সরাসরি চাপ প্রয়োগঃ দেহ কাঠামোর কোন হাড়ের উপর প্রত্যক্ষ বা সরাসরি আঘাতের ফলে যদি ঐ হাড় ভেঙ্গে যায় তাহলে তাকে প্রত্যক্ষ বা সরাসরি চাপ প্রয়োগের ফলে অস্থি ভঙ্গ বলে। যেমন- কোন প্রচন্ড আঘাত, বন্দুকের গুলি, গাড়ীর চাকায় বা গাড়ীর অন্য কোন অংশের চাপ ইত্যাদি।

(খ) পরোক্ষ বা দূরবর্তী চাপ প্রয়োগঃ দেহ কাঠামোর যে হাড়ে সরাসরি আঘাত লাগে সেখানকার হাড় না ভেঙ্গে পার্শ্ববর্তী কোন হাড় ভেঙ্গে গেলে তাকে পরোক্ষ বা দূরবর্তী চাপ প্রয়োগে অস্থিভঙ্গ বলে। যেমন উঁচু স্থান থেকে লাফ দিয়ে পড়ার ফলে

পায়ের উপর ভর দিয়ে পড়া হলেও দেখা যেতে পারে যে, পা বা উরু না ভেঙ্গে রেডিয়াম কিংবা কণ্ঠায় হার ভেঙ্গে গেছে।

(গ) পৈশিক চাপ প্রয়োগঃ বাহু কিংবা উরুর মাংসপেশীতে প্রচন্ড টান পড়ে কখনও কখনও বাহু বা উরুর হাড় ভেঙ্গে যেতে পারে। এভাবে হাড় ভাঙ্গাকে পৈশিক চাপ প্রয়োগে হাড় ভাঙ্গা বলে।

অস্থি ভঙ্গের লক্ষণঃ অস্থি ভঙ্গের লক্ষণসমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) ব্যথাঃ অস্থি ভঙ্গের উপরে অথবা তার চারপাশে প্রচন্ড ব্যথা থাকবে।

(খ) শক্তিলোপঃ আহত অঙ্গের শক্তিলোপ পাবে এবং আহত অঙ্গের স্বাভাবিক সঞ্চালন ক্রিয়া ব্যাহত হবে।

(গ) ফুলে যাওয়াঃ আহত অঙ্গ ফুলে যাবে। অনেক সময় আহত অঙ্গ এত বেশি ফুলে যায় যে, অস্থি ভঙ্গের অন্যান্য চিহ্ন ও লক্ষণ নির্ধারণ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

(ঘ) অঙ্গের বিকৃতিঃ আহত অঙ্গের সন্ধি ভ্রষ্ট হয় এবং সেই জন্য আহত অঙ্গ অস্বাভাবিক আকার ধারণ করে। মাংসপেশীর সংকোচনের ফলে ভাঙ্গা হাড়ের এক প্রান্ত অপর প্রান্তের উপর উঠে পড়তে পারে এবং এর ফলে ঐ অঙ্গ ছোট হয়ে যেতে পারে।

(ঙ) অস্থির অসমতাঃ দেহের যে স্থানের হাড় চামড়ার ঠিক নিচে অবস্থিত সেই স্থানের হাড় ভেঙ্গে গেলে তা ঐ স্থানে হাত দিয়ে ঐ স্থানকে উঁচু-নিচু বা অসমান বলে অনুভব করা যায়।

(চ) অস্বাভাবিক সঞ্চালনঃ অঙ্গটির অস্বাভাবিক সঞ্চালন সম্ভব।

(ছ) ক্রিপি টাস বা হাড়ের খটখট শব্দঃ হাড়ভাঙ্গা অংশে দুটি ভাঙ্গা হাড়ের অংশ পরস্পরের উপর ঘসা লাগলে খটখট শব্দ হতে পারে। এই শব্দ অনেক সময় কানে শোনা যেতে পারে। আবার অনেক সময় এই শব্দ কানে শোনা নাও যেতে পারে। কখনও তা কেবল উপলব্ধি করা যেতে পারে।

শেষোক্ত লক্ষণ দুটি কেবলমাত্র অভিজ্ঞ ডাক্তার পরীক্ষা করে বলতে পারেন। কোন প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর পক্ষের এই লক্ষণগুলি বোঝা সম্ভব নয়। গ্রীন স্টিক এবং সংবিদ্ধ ভঙ্গে উল্লিখিত লক্ষণ দুটি বিদ্যমান থাকে না।

বিভিন্ন প্রকার সাধারণ অস্থি ভঙ্গের প্রাথমিক প্রতিবিধানঃ

নিম্নে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে সাধারণ অস্থি ভঙ্গের প্রতিবিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

(ক) মাথার খুলিঃ প্রথমে ক্ষতস্থানকে কোন জীবাণুনাশক লোশন দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এরপর ক্ষতস্থানের উপর প্যাড স্থাপন করে (হাড় যদি ভিতরে ঢুকে যায় তাহলে রিং প্যাড ব্যবহার করতে হবে) একটি ত্রিকোণী ব্যান্ডেজের ভূমি বরাবর একটি ছোট ভাঁজ করে নিয়ে ভূমির মধ্যভাগকে কপালের ঠিক মাঝখানে রেখে ব্যান্ডেজের শীর্ষটিকে মাথার পেছনের দিকে নিতে হবে। এবার ব্যান্ডেজের প্রান্ত দুটিকে মাথার দুপাশ থেকে মাথার পেছনের দিকে নিয়ে মাথার পেছনে একটি হাফ হিচ দিয়ে আবার ব্যান্ডেজের প্রান্তদ্বয় মাথার দু'পাশ থেকে মাথার সামনের দিকে এনে কপালের ঠিক মাঝখানে একটি ডাক্তারী গেরো বাঁধতে হবে। ডাক্তারী গেরো বাঁধা শেষ হলে ব্যান্ডেজের প্রান্ত দুটির অতিরিক্ত অংশগুলিকে দুদিকের ব্যান্ডেজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে।

এই ব্যান্ডেজ বাঁধার সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন ব্যান্ডেজটি দেখতে খুবই পরিপাটি এবং ব্যান্ডেজ বাঁধার সময় যেন কান দুটি ব্যান্ডেজে ঢাকা না পড়ে। কান দুটি অবশ্যই খোলা থাকতে হবে।

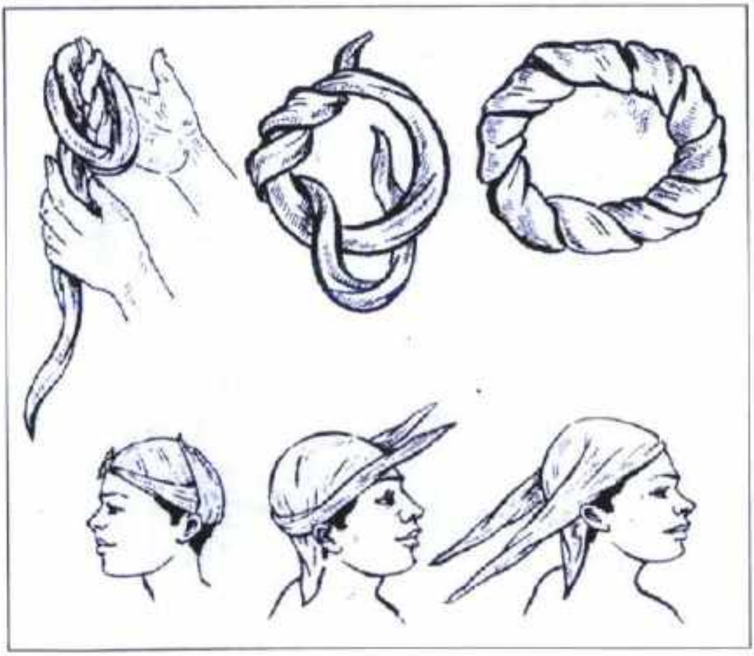

(খ) নিম্ন চোয়ালঃ আহত অঙ্গে যদি কোন ক্ষত হয় তাহলে প্রথম ক্ষতস্থানকে কোন জীবাণুনাশক লোশন দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এরপর ক্ষতস্থানের উপর প্যাড স্থাপন করতে হবে। এবার একটি ত্রিকোণী ব্যান্ডেজকে সরু ব্যান্ডেজে রূপান্তরিত করে ব্যান্ডেজের মধ্যভাগ স্থাপিত প্যাডের উপর রেখে ব্যান্ডেজের প্রান্তদুটি ঘুরিয়ে মাথার উপর নিয়ে ব্যান্ডেজে একটি হাফ হিচ দিতে হবে। এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে ব্যান্ডেজের প্রান্তদ্বয় ঘুরিয়ে মাথার উপর নেবার সময় যেন কান ঢাকা না পড়ে। কান দুটি খোলা থাকবে। এবার ঐ হাফ হিচকে আলগা করে ব্যান্ডেজের দুই অংশের একটি কপালে এবং অপরটি মাথার পেছনে নিয়ে যেতে হবে। এবার ব্যান্ডেজের দুই প্রান্তকে মাথার উপর দিয়ে ডাক্তারী গেরো বেঁধে ব্যান্ডেজ শেষ করতে হবে। ব্যান্ডেজ বাঁধার পর তা যেন দেখতে পরিপাটি দেখায়।

(গ) পাঁজরের হাড়ঃ আহত অংশে যদি কোন ক্ষত হয় তাহলে ক্ষত স্থানকে প্রথমে কোন জীবাণুনাশক লোশন দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এরপর আহতস্থানে প্যাড স্থাপন করতে হবে। আহত অঙ্গে প্যাড স্থাপন করার পর দুটি ত্রিকোণী ব্যান্ডেজকে ভাঁজ করে চওড়া ব্যান্ডেজে রূপান্তরিত করে আহত অঙ্গের উপর ব্যান্ডেজটি স্থাপন করে ব্যান্ডেজের প্রান্তদ্বয় আহত অঙ্গের বিপরীত দিকে নিয়ে

প্রান্তদ্বয় দিয়ে ডাক্তারী গেরো বাঁধতে হবে। ডাক্তারী গেরো বাঁধা শেষ হলে প্রান্তদ্বয়ের অবশিষ্ট অংশ ব্যান্ডেজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। এবার দ্বিতীয় ব্যান্ডেজটি প্রথম ব্যান্ডেজের উপর এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে দ্বিতীয় ব্যান্ডেজটি দিয়ে প্রথম ব্যান্ডেজের অর্ধেক ঢাকা থাকে। এভাবে দ্বিতীয় ব্যান্ডেজটি স্থাপন করার পর এই ব্যান্ডেজের প্রান্তদ্বয়কে আহত অঙ্গের বিপরীত দিকে নিয়ে প্রান্তদ্বয় দিয়ে ডাক্তারী গেরো বাঁধতে হবে। ডাক্তারী গেরো বাঁধা শেষ হলে প্রান্তদ্বয়ের অতিরিক্ত অংশ ব্যান্ডেজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে ব্যান্ডেজ বাঁধার পর তা যেন দেখতে পরিপাটি দেখায়।

(ঘ) **হাত ভাঙ্গাঃ** হাত ভেঙ্গে গেলে প্রথমে আহত অঙ্গে স্প্লিন্ট ও প্যাড দিয়ে হাতকে শক্ত করে বাঁধতে হবে। ভাঙ্গা অংশের উপর কোন বাঁধন দেওয়া যাবে না। আহত হাতকে আরামে রাখার জন্য আহত হাতে স্লিং দিয়ে ঝুঁলিয়ে রাখা হয়। একে আর্ম স্লিং বলে। আর্ম স্লিং দেয়ার জন্য একটি ত্রিকোণ ব্যান্ডেজের এক প্রান্তকে আহত হাতের বিপরীত কাঁধে রাখতে হবে। এবার আহত হাতকে ৯০° কোণ ভাঁজ করে বুক বরাবর রাখতে হবে। এবার ত্রিকোণ ব্যান্ডেজের অপর প্রান্তকে আহত হাতের উপর দিয়ে কাঁধের উপর নিয়ে ব্যান্ডেজের দুই প্রান্তকে দিয়ে ডাক্তারী গেরো বাঁধতে হবে। গেরো বাঁধার পর প্রান্তের অতিরিক্ত অংশকে ব্যান্ডেজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। গেরোটি থাকবে আহত কাঁধের কণ্ঠার হাড়ের উপর। এবার কনুই এর কাছে ব্যান্ডেজের যে শীর্ষ আছে তাকে টেনে নিয়ে কনুই এর উপর ব্যান্ডেজের যে অংশ আছে তার সাথে সেফটিপিন দিয়ে আটকে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে ব্যান্ডেজ বাঁধার পর তা দেখতে যেন পরিপাটি দেখায়।

(ঙ) **কণ্ঠাস্থি ভাঙ্গাঃ** কণ্ঠাস্থি ভেঙ্গে গেলে যে কণ্ঠাস্থি ভেঙ্গেছে সেই হাতের বগলে পরিমাণ মত প্যাড দিয়ে কাঁধকে একটু উঁচু করতে হবে। এবার একটি ব্যান্ডেজকে ভাঁজ করে সরু করে সরু ব্যান্ডেজে রূপান্তরিত করে আহত কণ্ঠাস্থির দিকের বাহুর উপর ঐ ব্যান্ডেজ রেখে ব্যান্ডেজের প্রান্ত দুটিকে শরীর ঘুরিয়ে বিপরীত দিকে নিয়ে দুই প্রান্ত দিয়ে একটি ডাক্তারী গেরো বাঁধতে হবে। এই গেরোটি এমন জায়গায় বাঁধতে হবে যেন রোগীর সামনে দাঁড়ালে তা পরিস্কারভাবে দেখা যায়।

এই ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেলে আহত কণ্ঠাস্থির হাতকে ভাঁজ করে বুকের উপর এমনভাবে রাখতে হবে যেন হাতের আঙুলগুলো বিপরীত কাঁধের প্রায় কণ্ঠাস্থির উপর থাকে। এবার একটি ত্রিকোণ ব্যান্ডেজের এক প্রান্তকে আহত অঙ্গের বিপরীত কাঁধে রাখতে হবে। ব্যান্ডেজের অপর প্রান্তটি হাতের নিচ দিয়ে টেনে পিঠ ঘুরিয়ে অপর প্রান্তের সাথে একটি ডাক্তারী গেরো বাঁধতে হবে। এবার ব্যান্ডেজের শীর্ষ যা কনুই

এর কাছে আছে, তাকে ঘুরিয়ে কনুই এর উপরে ব্যান্ডেজের যে অংশ আছে তার সাথে সিফটিপিন দিয়ে আটকে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে বাঁধার পর ব্যান্ডেজ যেন পরিপাটি দেখায়।

(চ) উর্ধ্ব বাহু ভাঙ্গাঃ উর্ধ্ব বাহু ভেঙ্গে গেলে আহত হাতকে কনুই থেকে ভাঁজ করে বুকের উপর এমনভাবে রাখতে হবে যেন হাতের আঙ্গুল অপর দিকে কণ্ঠাস্থি প্রায় স্পর্শ করে। হাত এবং বুকের খালি স্থানে প্রয়োজনীয় প্যাড দিতে হবে। তিনটি ত্রিকোণ ব্যান্ডেজকে ভাঁজ করে দুটিকে চওড়া এবং একটিকে সরু ব্যান্ডেজে রূপান্তরিত করে নিতে হবে।

এবার আহত হাতে নিম্নোক্ত ব্যান্ডেজগুলি বাঁধতে হবেঃ

(ক) এবার সরু ব্যান্ডেজের মধ্যভাগ দিয়ে কব্জিতে একটি বড়শী গেরো বাঁধতে হবে। এরপর ব্যান্ডেজের প্রান্তদ্বয়ের একটিকে অপর কাঁধ ঘুরিয়ে আহত হাতের কাঁধের উপর রাখতে হবে এবং অপর প্রান্তকে আহত হাতের কাঁধের উপর রেখে প্রান্ত দুটিকে একত্রে করে কণ্ঠাস্থির হাড়ের উপর একটি ডাক্তারী গেরো বাঁধতে হবে।

(খ) আহত বাহুর উপরে অথবা নিচে একটি চওড়া ব্যান্ডেজের মধ্যভাগ স্থাপন করে বাহু ও দেহকে জড়িয়ে ব্যান্ডেজের প্রান্ত দুটি শরীরের বিপরীত দিকে এনে প্রান্তদ্বয়কে একত্র করে একটি ডাক্তারী গেরো বাঁধতে হবে। গেরো বাঁধা শেষ হলে প্রান্তের অতিরিক্ত অংশগুলি ব্যান্ডেজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে।

(গ) আহত বাহুর কনুই এর উপর চওড়া ব্যান্ডেজের মধ্যভাগ স্থাপন করে বাহু ও দেহ জড়িয়ে ব্যান্ডেজের প্রান্ত দুটি শরীরের বিপরীত দিকে এনে প্রান্তদ্বয়কে একত্র করে একটি ডাক্তারী গেরো বাঁধতে হবে। গেরো বাঁধা হলে প্রান্তের অতিরিক্ত অংশগুলি ব্যান্ডেজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে ব্যান্ডেজ বাঁধার পর তা দেখতে যেন পরিপাটি দেখায়।

(৪) নাক দিয়ে রক্তপাত বন্ধকরণঃ নাক দিয়ে রক্তপাত বন্ধ করার জন্য প্রথমে রোগীকে নিরাপদ ছায়াযুক্ত জায়গায় স্থানান্তরিত করে তাকে কোন চেয়ারে বা টুলে বসাতে হবে। এরপর রোগীর শরীরের সব আটসাট পোশাক ঢিলা করে দিতে হবে। রোগীর পাকে গরম কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে অথবা সহনীয় গরম পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে। রোগীর মাথাকে সামনের দিকে ঝুকিয়ে রাখার জন্য এবং নাকের পরিবর্তে মুখ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়াচালু রাখার জন্য এবং রোগীর হাত দুটিকে মাথার উপরে তুলে রাখার জন্য বলতে হবে। রোগীর নাকে তুলা দিয়ে নাক বন্ধ রাখতে হবে। যেদিক থেকে প্রাকৃতিক বাতাস বইছে রোগীর মুখকে সেইদিকে রেখে বসাতে হবে। রোগীর মুখে এবং ঘাড়ে ঠান্ডা পানির প্রলেপ দিতে হবে এবং ঠান্ডা পানিতে হাত ডুবিয়ে রোগীর মাথার চুলে বিনুনী দিতে হবে।
উপরোক্ত ব্যবস্থা করলে রোগীর নাক দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে।

(৫) মুর্ছা যাওয়ার প্রতিবিধান ঃ স্নায়ু প্রণালীর ক্রিয়াকোন কারণে বাঁধাগ্রস্ত হলে মাথার কাজের ব্যাঘাত ঘটে, ফলশ্রুতিতে মানুষ মুর্ছা যায়। মুর্ছাপ্রাপ্ত রোগীর জন্য নির্ধারিত প্রাথমিক প্রতিবিধান করতে হবেঃ

(ক) রোগীকে নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তরিত করতে হবে।

(খ) রোগীর পরিধেয় আটসাট কাপড় ঢিলে করে দিতে হবে।

(গ) রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়াদি বন্ধ হয়ে থাকলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়াস্বাভাবিক করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়াস্বাভাবিক থাকলে রোগীকে চিত করে শুইয়ে তার মুখকে এক পাশে কাত করিয়ে রাখতে হবে। রোগীর মুখমন্ডল পান্ডুর থাকলে তার কাঁধকে নিচের দিকে রেখে পা দুইটিকে উঁচু করে রাখতে হবে (মাথা পায়ের চেয়ে নিচে থাকবে)। রোগীর মুখমন্ডলে রক্তের আধিক্য থাকলে মাথাকে উঁচু করে রাখতে হবে।

(ঙ) রোগীকে প্রচুর মুক্ত বাতাস গ্রহণ করার সুযোগ দিতে হবে।

(চ) যে কারণে রোগী মুর্ছা গিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তার উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ছ) যতক্ষণ রোগী সচেতন ততক্ষণ পর্যন্ত রোগীকে মুখে খাওয়ার জন্য কোন খাদ্য দেয়া যাবে না।

(জ) রোগীর জ্ঞান ফিরে আসলে আস্তে আস্তে রোগীকে পানি পান করতে দিতে হবে। যদি রোগীর নাড়ী ক্ষীণ না হয় অথবা অভ্যন্তরীণ ক্ষরণের কোন সন্দেহ

না থাকে তাহলে রোগীকে গরম চা বা কফি পান করার জন্য দেয়া যায়। রোগী যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে সে বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

(ঝ) রোগীর মুখমন্ডলে পর্যায়ক্রমে ঠান্ডা ও গরম পানির ঝাপটা দিতে হবে এবং হৃৎপিন্ড ও পাকস্থলীর উপর গরম সেক দিতে হবে।

যদি খাদ্যাভাসের জন্য রোগী মুর্ছা গিয়ে থাকে তাহলে রোগীকে খাবার দিতে হবে। কিন্তু এই খাদ্য প্রথমে অল্প পরিমাণ দিতে হবে।

পোড়াঃ সরাসরি আগুন বা জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে রাখা কোন উত্তপ্ত জিনিসের সংস্পর্শে অথবা ঘুরন্ত কোন চাকার সংস্পর্শে আসার পর শরীর পুড়ে গেলে তাকে পোড়া (BURN) বলে। এছাড়া তীব্র তাপ ও এসিড দিয়েও শরীর পুড়ে যেতে পারে। শরীর পুড়ে গেলে চামড়া লাল হয়ে যেতে পারে, শরীরের গভীরে অবস্থিত তন্তুগুলি পুড়ে কালো হয়ে যেতে পারে।

দাহঃ ফুটন্ত তরল জিনিস দিয়ে শরীর পুড়ে গেলে তাকে দাহ (SCALD) বলে।

প্রাথমিক প্রতিবিধানঃ পোড়া বা দাহের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রাথমিক প্রতিবিধান করতে হবে।

(ক) শরীরের পোশাক পুড়ে গিয়ে শরীরের সাথে লেগে থাকলে পরিষ্কার কাঁচি দিয়ে আশপাশের কাপড় কেটে ফেলতে হবে। পোড়া বা দাহের উপর আটকে থাকা কাপড় তোলা যাবে না।

(খ) ফোস্কা গেলে বা ফাটিয়ে দেয়া যাবে না।

(গ) পোড়া বা দাহ স্থানে বাতাস যাতে না লাগে সেজন্য পোড়া বা দাহ অংশকে গরম কাপড় দিয়ে ঢেকে আলগাভাবে বেঁধে রাখতে হবে। এক লিটার গরম পানিতে টেবিল চামচের এক চামচ বেকিং সোডা মিশিয়ে লোশন তৈরি করে আহত অঙ্গে ঐ লোশন প্রয়োগ করতে হবে।

(ঘ) রোগীকে দ্রুত ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে অথবা রোগীর কাছে ডাক্তারকে আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) রোগীকে প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা পানি পান করাতে হবে।

(৭) ক্ষতস্থানে ড্রেসিং ও ব্যান্ডেজঃ শরীরে কোন স্থানে ক্ষত হলে প্রথমে ক্ষতস্থানকে কোন জীবাণুনাশক লোশন দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এরপর ঐ স্থানে কোন পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ক্ষতস্থানে ড্রেসিং দেয়া হয় ক্ষতস্থানকে বাইরের দূষিত জীবাণু থেকে রক্ষা করার জন্য। ড্রেসিং ব্যবহার করার পর বাঁধতে হবে প্রয়োজন অনুসারে।

(৮) সর্প দংশনের চিকিৎসাঃ সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, সব সাপই বিষধর নয়। কিছু সাপ আছে যারা বিষধর। বিষহীন সাপ কামড়ালে ভয়ের কোন কারণ থাকে না। বিষহীন সাপ কামড়ালে ক্ষতস্থানে ইংরেজী 'ইউ' আকারের আঁচড় দেখা যায়। অপরদিকে বিষধর সাপ কামড়ালে ক্ষতস্থানে পাশাপাশি দুটি গর্ত পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। যদি বিষহীন সাপ কামড়ায় তাহলে ক্ষতস্থানকে 'পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট' মিশ্রিত পানি দিয়ে ক্ষতস্থানকে পরিষ্কার করে ক্ষতস্থানের উপর ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতে হবে। তাৎণিকভাবে পটাশিয়াম

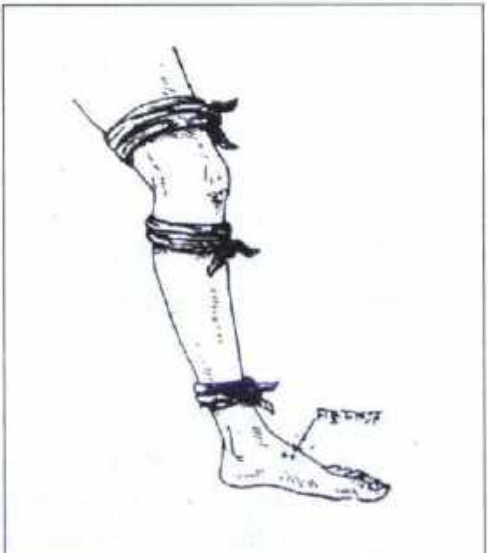

পারম্যাঙ্গানেট পাওয়া না গেলে গরম পানি দিয়ে ক্ষতস্থানকে ধুয়ে দিলেই হবে।

অপরদিকে বিষধর সাপ কামড়ালে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে হবেঃ

(ক) ডাক্তার আনার জন্য খুব তাড়াতাড়ি লোক পাঠাতে হবে। অথবা দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

(খ) সাপের বিষ যাতে শরীরের রক্তকে জমাট বাঁধতে না পারে এবং শরীরের সমস্ত রক্ত যাতে বিষক্রিয়ার ফলে দূষিত হয়ে না পড়ে, তার জন্য আহত অঙ্গের শিরায় রক্ত চলাচল ক্রিয়াকে পুরোপুরিভাবে বন্ধ করে দিতে হবে। শিরার রক্ত চলাচল ক্রিয়াবন্ধ করার জন্য ক্ষতস্থান থেকে হৃৎপিন্ডের দিকে ক্ষতস্থানের নিকটতম স্থানে টুর্ণিকেট বাঁধতে হবে। অগ্রবাহু বা পায়ে সাপে কামড়ালে প্রথমে উর্ধ্ববাহু বা উরুর মাঝামাঝি স্থানে একটি তারপর তার নিচের দিকে অর্থাৎ হাঁটু/কনুইর একটু উপরেই আরেকটি এইভাবে দুই জায়গায় বাঁধতে হবে। এখানে স্মরণ রাখতে হবে হাতে অথবা পায়ে টুর্নিকেট বা বাঁধন দিলে কোন কাজে আসবে না। কারণ হাতে ও পায়ে দুটি হাড় আছে। ফলে যত জোরে বাঁধন দেয়া হোক না কেন দুই হাড়ের মধবর্তী শিরার মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। এতে এই বিষ হৃৎপিন্ডে প্রবেশ করে শরীরের সব রক্তকে বিষাক্ত করে তুলবে। টুর্ণিকেট ব্যবহার করা হলে পনের মিনিট পর পর আগের বাঁধনের সামান্য উপরে একটি শক্ত বাঁধন দিয়ে পূর্বেকার বাঁধন খুলে দিতে হবে। এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত ডাক্তার না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে।

(গ) টুর্নিকেট বাঁধার পর ক্ষতস্থানকে 'পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট' মিশ্রিত পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। তাৎক্ষণিকভাবে 'পটাশিয়া পারম্যাঙ্গানেট' পাওয়া না গেলে সহনীয় গরম পানি দিয়ে ক্ষতস্থানকে পরিষ্কার করে দিতে হবে। কারণ সাপের বিষ রক্তের সাথে শুকনো অবস্থায় অনেকক্ষণ বেঁচে থাকে। এই লোশন বা গরম পানি দিয়ে ধুলে এ বিষ নষ্ট হয়ে যায়। এরপর খুবই ধারালো ব্লেড বা ছুরি দিয়ে ক্ষতস্থানকে ৩/৪ ইঞ্চি বা প্রায় ২ সে.মি. গভীর করে ক্রসচিহ্ন আকারে চিরে ফেলে চেরা স্থানে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট গুড়া ঘষে দিতে হবে। ক্ষতস্থানকে উল্লিখিতভাবে চিরে ফেললে ঐ স্থান থেকে দূষিত রক্ত বের হয়ে যাবে এবং পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট গুড়া ঘসে দেয়ার ফলে সাপের বিষক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাবে। ক্ষতস্থানের উপরের অংশে খুব জোরে টুর্ণিকেট বাঁধার জন্য বেশি রক্তপাত হওয়ার ভয় নেই।

(ঘ) রোগীর দেহকে গরম রাখার জন্য রোগীর শরীর কম্বল বা ঐ জাতীয় জিনিস দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। রোগীকে কোন চিন্তা না করে পুরোপুরি বিশ্রাম নেয়ার জন্য বলতে হবে। রোগীকে সান্ত্বনামূলক কথাবার্তা বলে অভয় দিতে হবে। কারণ সাপের

বিষের ভয় রোগীকে অস্থির করে তুলতে পারে এবং এতে তার অবস্থা আরো খারাপ হতে পারে।

(ঙ) রোগীকে গরম চা বা কফি বা দুধ পান করার জন্য দিতে হবে। যাতে মাদকতা আনে এমন ধরণের কোন জিনিস এ সময় রোগীকে দেয়া যাবে না।

(চ) রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া স্বাভাবিক করে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ছ) রোগী যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে সে সম্পর্কে সচেষ্ট থাকতে হবে। সাপে কাটা রোগীকে ডাক্তার না আসা পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই ঘুমাতে দেয়া চলবে না।

(জ) সাপ যদি এমন জায়গায় কামড়ায় যেখানে বাঁধন দেয়ার সুযোগ নেই সেক্ষেত্রে (গ), (ঘ), (ঙ), (চ), (ছ) উপধারা অনুযায়ী রোগীর চিকিৎসা করতে হবে।

(খ) শিশুর ৭টি মারাত্বক রোগের কারণ ও প্রতিরোধ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ঃ

শিশুর জন্মের পর তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব কম থাকে তাই যে কোন রোগ জীবাণু সহজেই তাকে আক্রান্ত করতে পারে। যার ফলে সহজেই সে রোগাক্রান্ত হতে পারে। তাই শিশুদের প্রতি আমাদের বিশেষ যত্নশীল হতে হবে।

শিশুর ৭টি মারাত্বক রোগ হল– যক্ষা, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার, পোলিও, হাম এবং হেপাটাইটিস-বি। এছাড়াও রয়েছে নিউমোনিয়া।

এ সকল মারাত্মক রোগ থেকে শিশুকে বাচাঁনোর একমাত্র উপায় হলো সময়মত টিকা দেয়া।

টিকা ঃ

টিকা একটি জৈবিক পদার্থ। যা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে রোগ জীবানুর ক্ষতিকারকতা নষ্ট করে। ফলে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। তবে যে রোগের টিকা দেয়া হয় শুধুমাত্র সেই রোগের প্রতিরোধ যোগায়। যেমন- মিজেলস এর টিকা দিলে হাম রোগের প্রতিরোধ করে।

জন্মের পর থেকে ১১ মাসের মধ্যে শিশুকে এ সকল টিকা দিতে হয়। ৮টি মারাত্মক রোগের বিরুদ্ধে শিশুকে মোট ৪টি টিকা দিতে হয়।

শিশুর মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধিগুলো হলোঃ ধনুষ্টংকার, যক্ষা, ডিপথেরিয়া, হাম, হুপিং কাশি ও পোলিও। এই সবকয়টি রোগই সংক্রামক ও বাংলাদেশে বিদ্যমান। এক বছরের কম বয়সের শিশুদের এগুলো মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করে। এগুলো

শিশুদের মৃত্যুর কারণও হতে পারে। ইপিআই কার্যক্রমের মাধ্যমে এ ছয়টি রোগই প্রতিরোধ করা সম্ভব। ইপিআই কার্যক্রমের আওতায় আরেকটি প্রতিরোধযোগ্য ব্যাধি হচ্ছে "হেপাটাইটিস বি" যা এই কার্যক্রমের সাথে নতুন সংযুক্ত করা হয়েছে।

এই রোগগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ-

ধনুষ্টংকার

কারণঃ পশুর মলের মাধ্যমে নির্গত এই রোগের জীবাণু মাটির সাথে মিশে থাকে। এই রোগের জীবাণু কাটা স্থান দিয়ে শরীরে ঢকে। শিশুর জন্মের পর অপরিষ্কার (জীবাণুযুক্ত) ছুরি, কাচি, বা বেড দিয়ে নাড়ী কাটলে অথবা কাচা নাড়ীতে গোবর বা ময়লা কাপড় ব্যবহার করলে নবজাতক শিশুর (৩ থেকে ২৮ দিন) ধুনষ্টংকার রোগ হয়ে থাকে।

লক্ষণঃ জন্মের ১ম ও ২য় দিন স্বাভাবিকভাবে কাঁদতে পারে এবং বুকের দুধ টেনে খেতে পারে। জন্মের ৩/২৮ দিনের মধ্যে শিশু অসস্থ হয়ে পরে এবং শিশু বকের দুধ খাওয়া বন্ধ করে দেয়। শিশুর মুখ ও চোয়াল শক্ত হয়ে যায় এবং জোরে কাঁদতে পারে না। শিশুর খিচুনি হয় এবং শরীর পিছনের দিকে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে যায়।

ভয়াবহতাঃ নবজাতকের ধনুষ্টংকার শিশু মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ। এই রোগের চিকিৎসা করা অত্যন্ত কষ্টকর। এই রোগে আক্রান্ত নবজাতক প্রায় মারা যায়।

প্রতিরোধঃ গর্ভবতী ও সন্তান ধারণক্ষম সকল মহিলাকে যথাশীঘ্র সম্ভব ৫ ডোজ টিটি টিকা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দিয়ে নবজাতকের ধনুষ্টংকার মৃত্যু প্রতিরোধ করা যায়। এছাড়া নিরাপদ প্রসব পদ্ধতি অভ্যাস করা ও নাড়ী কাটার জন্য জীবাণুমুক্ত ব্লেড ব্যবহার করতে হবে।

যক্ষ্মা

কারণ ঃ মাইক্রোব্যাকটিরিয়াম টিউবারকুলেসিস নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়। এটি একটি পরিচিত ছোঁয়াচে রোগ। যে কোন লোক যে কোন সময়ে এ রোগে সংক্রমিত হতে পারে। যারা অধিক পরিশ্রম করে, ছবল স্যাঁতস্যাতে বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে এবং অপুষ্টিতে ভোগে বা যক্ষ্মা রোগীর সাথে বাস করে তারা এ রোগের শিকার হয়। শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় তারা দ্রুত এ রোগে আক্রান্ত হয়।

লক্ষণ ঃ

১। দেহের ওজন কমতে থাকে এবং আস্তে আস্তে শরীর দুর্বল হতে থাকে।

২। খুসখুসে কাশি হয় এবং কখনও কাশির সাথে রক্ত পড়তে দেখাযায়।

৩। রাত্রে শরীরে ঘাম হয় এবং বিকেলের দিকে অল্প জ্বর হয়।

৪। বুকে বা পিঠে ব্যাথা হয়।

৫। ভালো খাবার খেলেও শরীরে শক্তি পাওয়া যায় না।

৬। পেটের অসুখ দেখা দেয়।

প্রতিরোধ ঃ

শিশুদের বিসিজি টিকা দিতে হবে। শিশুর জন্মের এক বৎসরের মধ্যে ২৮ দিন বা এক মাস পর পর তিন ডোজ বিসিজি টিকা দিলে তা শিশুকে যক্ষা থেকে রক্ষা করে।

ডিপথেরিয়া

কারণঃ ক্ষুদ্র এক প্রকার জীবাণু ডিপথোরিয়া রোগাক্রান্ত শিশুর হাঁচি কাশির মাধ্যমে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। ঐ জীবাণু যদি সুস্থ শিশুর শরীরে প্রবেশ করে তখন এই রোগ দেখা দেয়।

লক্ষণঃ

১-৩ দিনঃ শিশু খুব সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ঠিকমতো খায় না এবং খেলাধুলা করে না। শিশুর জ্বর, সর্দি ও কাশি দেখা দেয়। গলা ফুলে যায় এবং কন্ঠনালী ও গলদেশের ভিতরে সরের মত সাদা আস্তরণ পড়ে।

৪-৬ দিনঃ শিশু খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে, কন্ঠনালীর গ্রন্থিগুলো খুব বেশী ফুলে যায়। কন্ঠনালীতে ধুসর রং-এর সুস্পষ্ট আস্তর পড়ে। এটা শ্বাসনালীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং শ্বাসকষ্টের সৃষ্টি করে।

ভয়াবহতাঃ এ রোগ হৃদপিন্ড ও স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রান্ত করতে পারে এবং শিশুর মৃত্যু ঘটতে পারে।

প্রতিরোধঃ শিশুর জন্মের এক বৎসরের মধ্যে ২৮ দিন বা এক মাস পর পর তিন ডোজ ডিপিটি টিকা দিলে তা শিশুকে ডিপথোরিয়া থেকে রক্ষা করে।

হুপিং কাশি (পারটুসিস)

কারণঃ হুপিং কাশিতে আক্রান্ত শিশু হাঁচি কাশি দেওয়ার সময় বাতাসের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায় এবং আক্রান্ত শিশুর সংস্পর্শে এই রোগ ছড়ায়।

লক্ষণঃ

১ম সপ্তাহঃ শিশুর জ্বর হয়, নাক দিয়ে পানি পড়ে, চোখ মুখ লাল হয়ে যায়, কাশি দেখা দেয়।

২য় সপ্তাহঃ কাশি মারাত্মক আকার ধারণ করে। শিশু যখন কাশে তখন তার খুব কষ্ট হয় এবং চোখ স্ফীত ও লাল হয়ে যায়। কাশির পর শিশু "হুপ" শব্দ করে শ্বাস নেয়। অনেক সময় বমিও হয়। ছয় মাসের কম বয়স্ক শিশু "হুপ"শব্দ ছাড়াও কাঁশতে পারে এবং বমি করতে পারে। যদি কাশি তিন সপ্তাহের বেশী সময় ধরে চলে তাহলে হুপিং কাশি বলে অনুমান করা যেতে পারে।

৩য় সপ্তাহঃ কাশি ধীরে ধীরে কমে যায়।

ভয়াবহতাঃ হুপিং কাশির ফলে শিশু দুর্বল হয়ে যায় এবং অপুষ্টিতে ভোগে। শিশুর নিউমোনিয়া হতে পারে। শিশুর চোখে রক্ত জমাট বেঁধে অন্ধ হয়ে যেতে পারে। শিশুর মস্তিষ্কের ক্ষতি হতে পারে।

প্রতিরোধঃ শিশুর একবছর বয়সের মধ্যে ২৮ দিন বা একমাস অন্তর অন্তর তিন ডোজ ডিপিটি টিকা দিলে তা হুপিং কাশি থেকে রক্ষা করে। প্রথম ডোজ দেয়ার সবচেয়ে ভাল সময় হলো শিশুর ছয় সপ্তাহ বয়স। ৬ মাস বয়সের মধ্যেই শিশু মারাত্মকভাবে হুপিং কাশিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে, সে কারণে ৬ সপ্তাহ বয়স থেকে ডিপিটি দেয়া শুরু করা অত্যন্ত জরুরী।

পোলিও (পালিও মাইলাইটিস)

কারণঃ আক্রান্ত শিশুর মল দ্বারা, দূষিত পানি খেলে বা আক্রান্ত শিশুর সংস্পর্শে এলে এ রোগ হতে পারে।

লক্ষণঃ

১-৩ দিন ঃ শিশুর সর্দি কাশি ও সামান্য জ্বর হয়।

৩-৫ দিনঃ মাথা ব্যাথা করে ও ঘাড় শক্ত হয়ে যায়, জ্বর থাকে, শিশুর হাত অথবা পা অবশ হয়ে যায়, শিশু দাঁড়াতে চায় না। উঁচু করে ধরলে আক্রান্ত পায়ের পাতা ঝুলে পড়ে। দাঁড় করাতে চাইলে শিশু কান্নাকাটি করে। শিশুর আক্রান্ত অঙ্গ ক্রমশ দুর্বল হয়ে যায় এবং পরে স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়ে যেতে পারে।

ভয়াবহতাঃ শিশুর এক বা একাধিক অঙ্গ অবশ হয়ে যায়। ফলে আক্রান্ত অঙ্গ দিয়ে স্বাভাবিক কাজ করতে পারে না। আক্রান্ত অঙ্গের মাংস পেশী চিকন হয়ে যায়। শ্বাস প্রশ্বাসের পেশী অবশ হলে শ্বাস বন্ধ হয়ে শিশু মারাও যেতে পারে।

প্রতিরোধঃ এক মাস পর পর তিন ডোজ এবং হামের টিকা দেওয়ার সময় আরো একবার অর্থাৎ মোট চারবার পোলিও টিকা শিশুর এক বছর বয়সের ভিতরে খাওয়ানো হলে তা শিশুর দেহে পোলিও রোগ প্রতিরোধ করে। প্রথম ডোজ দেওয়ার সবচেয়ে ভালো সময় শিশুর ৬ সপ্তাহ বয়স। যদি কোন শিশুর ক্লিনিক বা হাসপাতালে জন্মগ্রহণ করে তাহলে তাকে জন্মের পরপরই এক ডোজ পোলিও টিকা দিতে হবে। এটাকে অতিরিক্ত ডোজ বলে গণ্য করতে হবে এবং শিশুর ৬ সপ্তাহ বয়স থেকে নিয়মিত চার ডোজের শিডিউল শুরু করতে হবে।

হাম

কারণঃ হামে আক্রান্ত শিশুর কাছ থেকে এই রোগের জীবাণু বাতাসের মাধ্যমে সুস্থ শিশুর শরীরে প্রবেশ করে এবং হাম রোগের সৃষ্টি করে।

লক্ষণঃ

১-৩ দিন ঃ বেশী জ্বর, সর্দি, কাশি, চোখ লাল হয়ে যায় এবং পানিতে টলটল করে।

চতুর্থ দিনঃ জ্বর কমে আসে, মুখে এবং শরীরে লালচে দানা দেখা দেয়।

হামে দানা উঠার দিন পর দানা কালচে হয়ে একসময় খুসকির মতো ঝরে যায়।

ভয়াবহতাঃ হামের ফলে শিশু নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া ও পুষ্টিহীনতায় ভোগে। কান পাকা রোগ হতে পারে, এমনকি চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে। হামের নানা জটিলতার কারণে অনেক শিশু মারাও যায়।

প্রতিরোধঃ শিশুর নয়মাস বয়স পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে তাকে এক ডোজ হামের টিকা দিলে সে হাম রোগের হাত থেকে রক্ষা পাবে। তবে এই টিকা অবশ্যই এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগেই দেওয়া উচিত। পুষ্টিহীন শিশুরা হামের ফলে মারাত্মক রোগ পরবর্তী জটিলতার সম্মুখীন হন। পুষ্টিহীন শিশুদের পুষ্টিকর পরিপূরক খাবার দিলে তা তাদেরকে হাম পরবর্তী অন্যান্য রোগ থেকে রক্ষা করতে পারে। হামে আক্রান্ত শিশুকে অবশ্যই এক ডোজ ভিটামিন-এ খাওয়াতে হবে। গ্রন্থি বগল বা ঘাড়ে ক্ষতের সৃষ্টি করে। অনেক দিন ধরে ধীরে ধীরে ওজন কমে যায়।

নিউমোনিয়া

কারণ ঃ নিউমোকক্কাস নামক ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়। নিউমোনিয়া ফুসফুসে হতে দেখা যায়। অত্যধিক ঠান্ডা লাগলে নিউমোনিয়া রোগ হতে পারে। হাম, ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি রোগের পরে ঠান্ডা লেগে নিউমোনিয়া রোগ হতে দেখা যায়। শিশুদের জন্য এটি একটি মারাত্মক রোগ।

লক্ষণ ঃ

১) কাশি ও শ্বাসকষ্ট হয়। শ্বাস নেওয়ার সময় নাকের ছিদ্র বড় হয়।

২) কাশলে বুকে ব্যাথা হয়।

৩) জ্বর হয়।

৪) আক্রান্ত রোগী খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে।

ভয়বহতা ঃ নিউমোনিয়া হলে শিশু শ্বাসকষ্টে ভোগে। অতিরিক্ত ঠান্ডা থেকে শিশুরা এ রোগে আক্রান্ত হয়। যা শিশুর মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

প্রতিরোধ ঃ বর্তমানে নিউমোনিয়া থেকে শিশুদের বাঁচানোর জন্য টিকা চালু হয়েছে। শিশুদের জন্মের পর পরই এ টিকা দেয়া হয়।

গ। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ঃ

১। স্বাস্থ্য পরিচর্যা বলতে কি বুঝি?

স্বাস্থ্য পরিচর্যা ঃ ব্যক্তির নিজস্ব স্বাস্থ্য সুরক্ষার জ্ঞান ও সুস্থ থাকার উপায়/পদ্ধতি গুলোকে স্বাস্থ্য পরিচর্যা বলে। স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য প্রতিদিন গোসল করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় পরিধান করা, সুষম খাদ্যগ্রহণ, প্রচুর পানি পান করা, নিয়মিত দাঁত মাজা, হাত-পা-চুল-নখ প্রভৃতির যত্ন নেয়া, পরিমিত বিশ্রাম গ্রহণ আবশ্যক।

২। স্বাস্থ্য পরিচর্যায় একজন ব্যক্তি কিভাবে নিজেকে সুস্থ্য রাখতে পারে ?

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার অভ্যাস একজন ব্যক্তিকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে তার পরিচ্ছন্নতা ও খাদ্যাভ্যাসের জন্য। স্বাস্থ্য পরিচর্যার এ সকল শর্ত মেনে চললে ব্যক্তি সহজে রোগাক্রান্ত হয় না। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যা ব্যক্তিকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

৩। স্যানিটেশন সম্পর্কে ধারণা অর্জন।

পরিষ্কারও জীবাণু মুক্ত পানি পান এবং স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহারের অভ্যাসকে স্যানিটেশন বলে।

(ঘ) মাদকাসক্তি সম্পর্কে জানাঃ

মাদকদ্রব্য : যে সব দ্রব্য সেবনে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবসন্নতা আনয়ন করে বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্নায়ুর উত্তেজনা সৃষ্টি এবং ব্যাথা উপশম করে তাই হল মাদকদ্রব্য। যখন কোন ব্যক্তি এ সব দ্রব্য সেবন ছাড়া চলতে পারে না অর্থাৎ এর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তখন ঐ ব্যক্তিকে আমরা মাদকাসক্ত ব্যক্তি বলে থাকি।

মাদকদ্রব্য কোন গুলোঃ আমাদের দেশে সাধারণত গাঁজা, ভাং, চরস, আফিম, মরফিন, হেরোইন, কোকেন, মদ ইত্যাদি মাদকদ্রব্য হিসেবে পরিচিত। এ ছাড়া বিশ্বে কোকেন ও আফিম থেকে তৈরী পেথেড্রিন, থিরাইন, কোডেইন এবং বার্বিচুয়েট ও এলএসডি থেকে কৃত্রিম উপায়ে তৈরী মেথাডন, ডায়াজেপাম (সিডাক্সেন, রিলাক্সেন) তৈরি করা হচ্ছে। এর সঙ্গে আরও রয়েছে তরল অ্যালকোহল শ্রেণীর মদ, যেমন- রাম, ভদকা, হুইস্কি ইত্যাদি।

মাদকের প্রতি আসক্ত হয় কেনঃ মানুষ কেন মাদকাসক্ত হয় তার বহুবিধ কারণ রয়েছে। এ সব কারণ সমূহকে পরিবেশগত, সামাজিক, মানসিক, ওষুধ সংক্রান্ত ইত্যাদি শ্রেণীতে আওতাভুক্ত করা যায়। মানুষ যে সব সুনির্দিষ্ট কারণে মাদকদ্রব্য অপব্যবহার করে নেশাগ্রস্থ- হয় সেগুলো হলো :

(১) মাদকদ্রব্যের প্রতি কৌতুহল (২) বন্ধু বান্ধব ও সঙ্গীদের প্রভাব (৩) নতুন অভিজ্ঞতা লাভের আশা (৪) সহজ আনন্দ লাভের বাসনা (৫) মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা (৬) নৈতিক শিক্ষার অভাব (৭) কৈশোর ও যৌবনের বেপরোয়া মনোভাব (৮) পরিবারে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার (৯) পারিবারিক কলহ ও অশান্তি (১০) বেকারত্ব, আর্থিক অনটন ও জীবনের প্রতি হতাশা (১১) মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে অজ্ঞতা।

মাদকাসক্তির কুফল : মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে মানুষের যে যে ক্ষতি হয় তা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল :

(১) মানসিক : উত্তেজনা, চরম অবসাদ, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, অসংলগ্ন ব্যবহার, আত্মহত্যার প্রবণতা ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়।

(২) শারীরিক : ক্ষয় রোগ, রক্ত দূষণ, কর্মক্ষতা হ্রাস, অনিদ্রা, পেটে ব্যথা, ক্ষুধা

মন্দা, স্নায়ুবিক দূর্বলতা ইত্যাদি দেখা যায়।

(৩) **সামাজিক :** জীবনের প্রতি হতাশা, কাজে অনীহা, পারিবারিক অশান্তি, অপরাধ প্রবণতা, সমাজের ঘৃণ্য ব্যক্তি হিসেবে গণ্য ইত্যাদি।

(৪) **আর্থিক :** সর্বস্বান্ত পরিবার পরিজনকে অনটনে ফেলা, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি প্রবণতা বৃদ্ধি, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে হাত পাতা, শেষ বয়সে অতি কষ্টে ও নিঃসঙ্গ জীবনযাপন ইত্যাদি।

মাদকাসক্তি থেকে পরিত্রাণের উপায়ঃ

(১) নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রসার করা।

(২) বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

(৩) মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা রোধ করা।

(৪) মাদকদ্রব্যের কুফল সবার কাছে তুলে ধরা।

(৫) অসৎ বন্ধুদের নিকট থেকে দূরে থাকা।

(৬) মাদকদ্রব্য আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা।

(৭) সমাজে মাদকদ্রব্যের প্রসাররোধে সামাজিকভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(৮) কাহিনী, গল্পের আকারে মাদকদ্রব্য সেবনকারীর পরিণতি তুলে ধরা।

(৯) মাদকাসক্তদের সমাজে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা।

(১০) মাদকদ্রব্য প্রতিরোধ দিবস জাতীয়ভাবে পালন করা।

আত্ম উন্নয়ন

১৭। ইংরেজী ভাষা ছাড়া অন্য একটি ভাষা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভঃ
স্পেনিশ, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান, আরবী, জাপানিজ, হিন্দি প্রভৃতি যে কোন ভাষা শিক্ষা বই থেকে প্রচলিত কয়েকটি শব্দ, বাক্য, গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জানতে হবে।

১৮। ক্যারিয়ার প্ল্যানিং কি? প্রয়োজনীয়তা কি? ক্যারিয়ার প্ল্যানিং তৈরি করা।

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ঃ
ক্যারিয়ার প্ল্যানিং বলতে বোঝায় ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা। এটি জীবন গড়ার একটি প্রক্রিয়া যেখানে থাকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য পেশা বেছে নেয়া, কাজ করা, পেশায় সফল হওয়ার জন্য কর্মপরিকল্পনা, পুনরায় সময় ও সুযোগমত পেশা বদল এবং পেশা পরবর্তী জীবনের পরিকল্পনা করা ইত্যাদি।

জীবনে সফল হতে হলে ক্যারিয়ার প্ল্যানিং এর কোন বিকল্প নেই। তাই একটি নির্দিষ্ট ধাপ ও ছক অনুসারে ক্যারিয়ার প্ল্যানিং করা সকলের অবশ্য কর্তব্য। এই প্ল্যানিং বিভিন্নভাবে সময় ও বয়সভেদে বিভিন্ন প্রকারে হতে পারে। তাই এখানে নমুনা হিসেবে ১০ ধাপে একটি ক্যারিয়ার প্ল্যানিং এর নমুনা প্রদান করা হল-

১ম ধাপঃ নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা নির্ধারণঃ যে কোন কাজ শুরু করার আগে নিজের সেই কাজের প্রতি আগ্রহ আছে কিনা তা জানা খুবই জরুরী। যেহেতু মানুষ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজে সফলতা পেতে পারে না সেহেতু স্কুল জীবনেই নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রতি লক্ষ্য রেখে কমপক্ষে ৩টি বিষয়ের উপর নিজের ক্যারিয়ার প্লানিং মনস্থির করে রাখা উচিত। একাধিক বিষয়ে মনস্থির করতে হবে এই জন্য যে কোন একটি বিষয়ে সুযোগ না আসলেও যেন অন্য বিষয়গুলোতে এগিয়ে যাওয়া যায়।

দ্বিতীয় ধাপঃ নতুন নতুন পেশা সম্পর্কে ধারনা রাখা ঃ বর্তমান প্রতিযোগিতাশীল বিশ্বে প্রতিনিয়তই পেশার গতি প্রকৃতি এবং ধরণ পাল্টাচ্ছে। প্রতিনিয়তই নতুন নতুন আকর্ষণীয় কাজের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের নতুন নতুন কাজের সুযোগ যেমন আই.টি. ডেভেলপার, কম্পিউটার সোর্সিং কলসেন্টার, ইত্যাদি নতুন নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাই প্রতিনিয়ত খবরের কাগজ, ইন্টারনেট, ম্যাগাজিন গুলো থেকে নতুন নতুন কাজ ও পেশা সম্পর্কে সম্যক ধরণা থাকতে হবে।

৩য় ধাপঃ প্রতিস্থাপন যোগ্য দক্ষতাঃ এমন কিছু দক্ষতা আছে (যেমন যোগাযোগ, নেতৃত্বের গুণাবলী, পরিকল্পনা প্রনয়ন ইত্যাদি) যেগুলো যে কোন পেশার জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। তাই কেউ যদি বর্তমান কোন পেশায় উপযুক্ত কোন একটি দক্ষতায় পারদর্শী থাকে, তবে সে উক্ত দক্ষতা পরে যে কোন নতুন কাজে প্রয়োগ করতে পারবে। তাই পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে এমন ধরনের পেশা নির্বাচন করা উচিত যেন সেই দক্ষতা পরে অন্য নতুন পেশায় প্রয়োগ করা যায়।

৪র্থ ধাপঃ প্রতিষ্ঠানিক ও অপ্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ঃ উপযুক্ত ৩টি ধাপ অনুসারে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা করে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানিক এবং অপ্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রয়োজন তা ঠিক করতে হবে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক গুণাবলীর উন্মেষ ঘটানোর জন্য প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপশি বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের (যেমন স্কাউট আন্দোলন) সাথে যুক্ত থাকে অত্যাবশ্যকীয়।

৫ম ধাপঃ যোগাযোগ ও পরিচিতিঃ বর্তমানে কোন পেশায় সফল হতে হলে শিক্ষার পাশাপশি কার্যকরী যোগাযোগ ও পরিচিতি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। তাই

শিক্ষার্থীদের ছোট বেলা থেকেই শিক্ষা গ্রহণের পাশাপশি চারিপাশের বিভিন্ন সামাজিক বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং উক্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞের সাথে সম্ভব হলে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। শিক্ষা জীবনে বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে কার্যকরী যোগাযোগ রক্ষা করা এবং সম্পর্ক উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম হল বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে নিজেকে জড়িত করা।

পেশাজীবনে বিভিন্ন পেশাজীবি সংগঠন, অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা অত্যাবশ্যকীয়।

৬ষ্ঠ ধাপঃ অভিজ্ঞতা অর্জনঃ বলা হয় "জানার কোন শেষ নেই" এবং বর্তমানে বিশ্বে কোন জ্ঞানই অকার্যকর নয়। পেশা জীবনের ছক আঁকার পাশাপশি ছাত্রদের আরো অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য পেশা জীবনে প্রবেশ করার পরবর্তী নতুন নতুন প্রশিক্ষণ গ্রহন নতুন নতুন কাজে অংশ গ্রহনের মাধ্যমে নিজের দক্ষতা বাড়ানোর ব্যাপারেও যত্নশীল হতে হবে।

৭ম ধাপঃ একজন আদর্শ নির্বাচনঃ মানুষ কখনো একলা চলতে পারে না। জীবন চলার পথে প্রত্যেক মানুষেরই একজন করে আদর্শ ব্যক্তি নির্বাচন করা উচিত। যার আদর্শের আলোকে নিজেদের পরবর্তী জীবন পরিচালিত হবে। সেই আদর্শ ব্যক্তি হতে পারে নিজের মা-বাবা অথবা নিজের কোন প্রিয় শিক্ষক অথবা কোন মহান ব্যক্তির আদর্শ ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে, জীবনে চলার পথে কোন ভুল ত্রুটি হলে, উক্ত ব্যক্তিদের উপদেশ অথবা জীবনাদর্শ হবে ভুল শোধানোর এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার মূলমন্ত্র।

৮ম ধাপঃ পেশা পরিবর্তনঃ পেশা পরিবর্তন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। মানুষ তার সুবিধা অসুবিধা, কাজের সুযোগ, চারিপাশের প্রকৃতি, ইচ্ছা অনিচ্ছার কারণে প্রতিনিয়তই আরো ভালো কোন কাজের সন্ধান করে। তবে নতুন কোন কাজে প্রবেশ করার আগে সেই কাজ সম্পর্কে পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে সেই কাজে প্রবেশ করা উচিত।

৯ম ধাপঃ নিজেকে আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপনঃ যে কোন কাজে সফলতার গোপন রহস্য হল নিজেকে অন্যের সামনে আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন করা। প্রথমত প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং অপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষায় নিজেকে ভালভাবে প্রশিক্ষিত করতে হবে। এরপর বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে সুসম্পর্ক এবং বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে হবে। পেশা জীবনে প্রবেশের সময় যে কোন পেশায় আবেদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় সি.ভি, সি.ভি. লেখার কভার লেটার, মৌখিক পরীক্ষার কলাকৌশল, নিজের বেতন-ভাতা সম্পর্কে কর্মদাতাদের সাথে আলোচনা ইত্যাদি দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

পেশাজীবনে সহকর্মীদের সাথে বন্ধুত্ব পূর্ন আচরণ করতে হবে। উপযুক্ত নানা উপায়েই বন্ধুত্বসূলভ আচরণের মাধ্যমে নিজেকে অন্যের কাছে আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন করে তুলতে হবে।

১০ম ধাপঃ সহনশীলতা, ধৈর্য ধারণ এবং বন্ধুসুলভ আচরণঃ সবশেষে ক্যারিয়ার প্লানিং এর ক্ষেত্রে নিজেকে অবশ্যই সহনশীল, ধৈর্যবান, কর্মঠ হতে হবে এবং সর্বাবস্থায় বন্ধুত্বসূলভ আচরণ করতে হবে। মানুষ সব সময় সকল কিছুতে সফল হয় না কিন্তু একবার ব্যার্থ হলে সহনশীলতা এবং ধৈর্য্যধারণ করে কর্মঠ হলে সফলতা নিশ্চিতভাবে ধরা দেয়। তাই শিক্ষার্থীদের মনে রাখতে হবে, আবেগের বশে কোন হঠকারী সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে জীবনের চরমভুল। বরং বৈরী পরিবেশের মাঝে ধৈর্য্য, অধ্যাবসায় এবং নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাওয়াই হচ্ছে সফল মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

১৯। বিশেষ পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জনঃ

নিম্নের যে কোন একটি বিষয়ে "স্বনির্ভর ব্যাজ" অর্জন (অন্ততঃ এক বছর) ঃ

কম্পিউটার, পোলট্রি ও মৎস্য চাষ, ডেইরি ফার্ম, সেলাই কাজ (সেলাই, বুক, বাটিক, এমব্রয়ডারী), বিউটিশিয়ান, পর্যটন কর্মী, আলোকচিত্র শিল্পী, সেটেলাইট ও টেলিকমিউনিকেশন, সাংবাদিকতা, নার্সারী, ইন্টেরিয়র ডিজাইন, শিল্পকলা (সঙ্গীত, যন্ত্র সঙ্গীত, নৃত্য), চিত্র ও কারুশিল্প, সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স ইত্যাদি।

উল্লেখিত বিষয়ে প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তার সনদ পত্র ও পরিকল্পনাসহ কাজের অনুমতির জন্য রোভার ইউনিটে আবেদন করতে হবে। তারপর উক্ত বিষয়ে অন্ততঃ পক্ষে এক বছর সময় কাজ করতে হবে।

নিম্নের যে কোন একটি বিষয়ে "স্কাউট কর্মী ব্যাজ" অর্জন ঃ

প্রাথমিক প্রতিবিধান, পাইওনিয়ারিং, সিগনালিং, উদ্ধার কর্মী, হেলথ মোটিভেটর ইত্যাদি।

উল্লিখিত বিষয়ে প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বর্গের সাথে যোগাযোগ করে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বইপত্র (যেমন- প্রাথমিক প্রতিবিধান, দড়ির কাজ ইত্যাদি) পাঠ করে উল্লিখিত বিষয়ের যে কোন একটি বিষয়ে পরিমিত জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

সদস্য স্তর উত্তীর্ণে করণীয়ঃ

* নির্ধারিত ৩০টি ক্রু-মিটিংয়ের অতিরিক্ত এক বা একাধিক বিশেষ ক্রু-মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে। সদস্য স্তর বই পড়ে ও চর্চার মাধ্যমে বেশ কিছু বিষয়

শিখতে হবে। যা বিশেষ ক্রু-মিটিংয়ে জানাতে ও প্রদর্শন করতে হবে।

* যে সকল বিষয় নিয়মিত ক্রু-মিটিংয়ে জানার বা শেখার সুযোগ থাকবেনা এবং যে বিষয়গুলো ব্যক্তিগতভাবে শিখতে ও জানতে হবে শুধুমাত্র সেই বিষয়গুলোর ভিত্তিতেই বিশেষ ক্রু-মিটিংয়ের আয়োজন করতে হবে।

* স্তর শেষ হওয়ার পর লিপিবদ্ধকৃত লগ বই-এ অবশ্যই রোভারস্কাউট লিডার ও জেলা রোভার স্কাউট লিডারের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

* সদস্য স্তর সফল সমাপ্তির স্মারক স্বরূপ রোভারস্কাউট লিডার (আরএসএল) একজন রোভার স্কাউটকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষণ স্তরের ব্যাজ প্রদান করবেন।

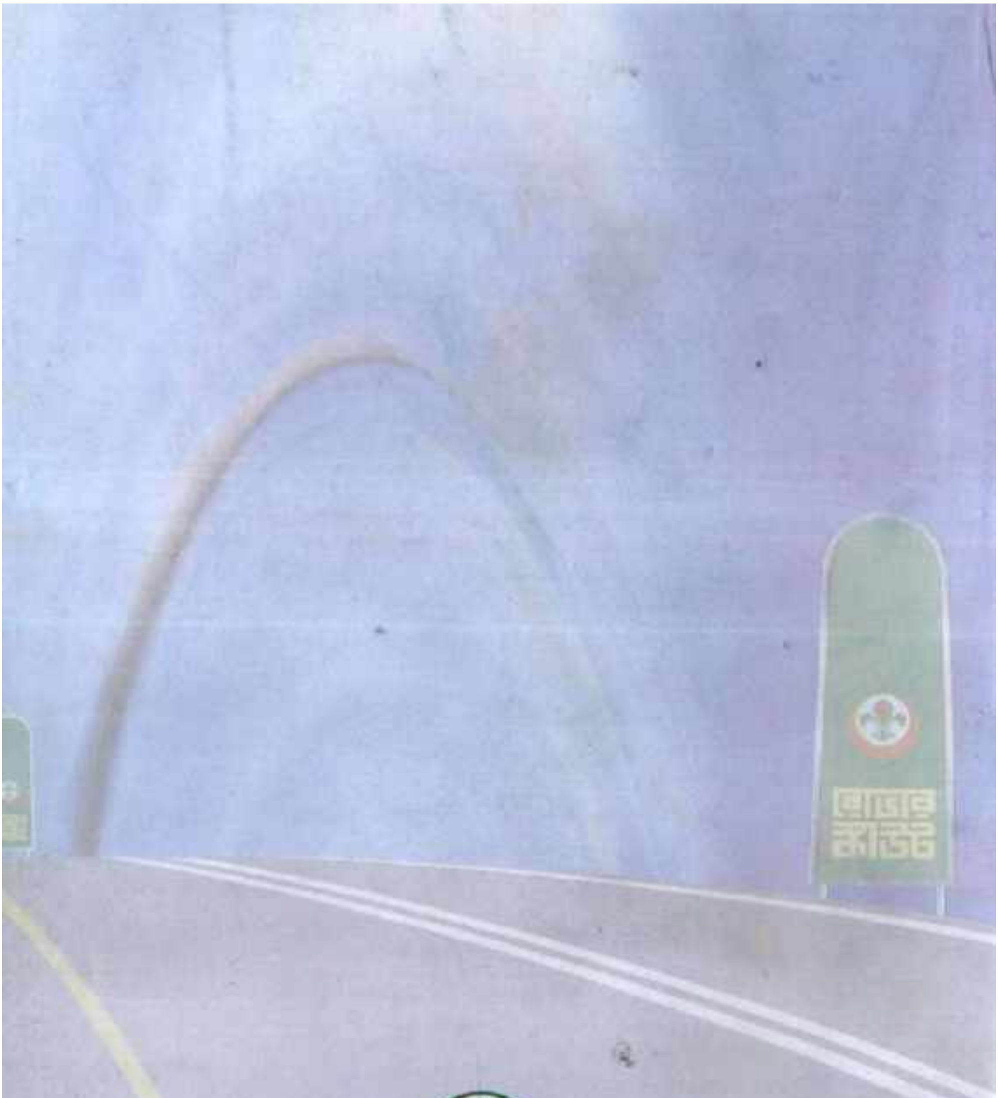

বাংলাদেশ স্কাউটস

জাতীয় সদর দফতর

৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম সড়ক, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

ফোন : ৯৩৩৩৬৫১, ৯৩৩৭৭১৪, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৩৪২২২৬

ই-মেইল : scouts@bangla.net

ওয়েব সাইট : www. scouts.gov.bd